ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা □ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

জাহানারা ইমামের
একাত্তরের দিনগুলি
মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

সদ্যপ্রয়াত
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
নির্বাচিত তিনটি গল্প

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
রাজ্যপাট

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ কথা
প্রবাসে ভোজ্যের বশে

কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে গ্রিক কথামৃত | অশোক মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা | কবিতা-পরিচয় | চণ্ডীমণ্ডপ | বই-ঠেক | ক্ষণের বচন | শব্দবক্র

২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

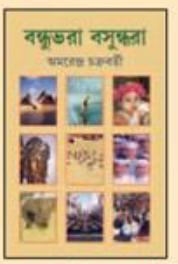

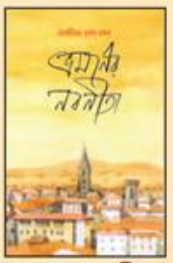

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

এবার অর্ধেকেরও কম দামে

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলেও খোঁজ করতে পারেন।

২০১৪-র জানুয়ারি থেকে 'কালের কষ্টিপাথর' প্রতি মাসের ১০ তারিখে প্রকাশিত হবে। প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ টাকা হলেও, আরও বেশি পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য এই জানুয়ারি থেকেই বার্ষিক গ্রাহকেরা এর অর্ধেক দামে নিয়মিত পত্রিকা পাবেন। ৬ জানুয়ারির মধ্যে ৩৬০ টাকার বদলে মাত্র ১৮০ টাকা পাঠিয়ে যাঁরা গ্রাহক হবেন, তাঁরা জানুয়ারি থেকেই সারা বছর অর্ধেক দামে পত্রিকা পাবেন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে অর্ধেকেরও কম দামে নিয়মিত পত্রিকা পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন

www.swarnakshar.in

নিখরচায় পড়তে পারেন:
www.ekashtipathar.com

৩৬০ টাকার জায়গায় এবার ১৮০ টাকায় গ্রাহক হোন

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ১৮০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 Fax: 2287-6448 E-mail: books@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা। নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ১১। শব্দবক্র ১১

চণ্ডীমণ্ডপ। বিচিত্র বিয়ে। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত তিনটি গল্প
দারিদ্র ৩৩ তিনি ৩৬ অবুঝ বৃষ্টিপাত ৩৮

ধা রা বা হি ক

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ২৩

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৫

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪১

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৫০
সৈয়দ মুজতবা আলি ১২
মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। সম্পাদকীয়। প্রতাপকুমার রায় ৪৯

ক বি তা র পা তা

ষাটের দশকের মহানগর থেকে দু'টি চিঠি ৬৮

এক কিশোর সম্পাদকের ঠিকানায় ৬৯

অশোক মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত পাঁচটি কবিতা ৬৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অনির্বাচিত একাদশী ৭২

কবিতা-পরিচয়
বাসা-বদল: অমিয় চক্রবর্তী ৫৩
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ● অরুণ সেন
কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● তরুণ সান্যাল ৫৭

ভ্র ম ণ ক থা

প্রবাসে ভোজ্যের বশে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ২৫

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্টক এক্সচেঞ্জ/লায়ন্স রেঞ্জ ৬৮

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৭১। বই-ঠেক ৭৪

প্রচ্ছদ: ২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

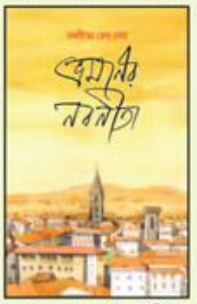

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

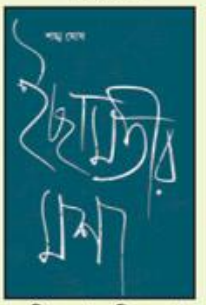

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড । ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০ **দ্বিতীয় খণ্ড** । ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

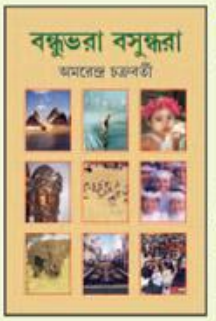

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

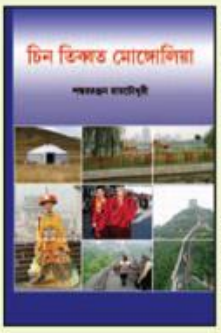

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

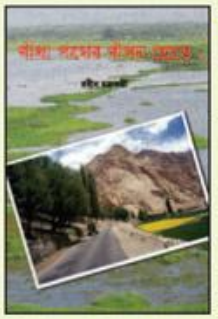

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২০ □ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩

উৎসর্গ

কমলকুমার মজুমদার
স্মরণীয়েষু

গত সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে আমরা যতটাই গৌরবান্বিত হয়েছি, ততটাই দুঃখ পেয়েছি। তাঁর কারুণ্য, তাঁর বহুবিধ পরিচয়ের মধ্যে তাঁর কবি-পরিচয় অনুল্লেখিত থেকে গেছে।

আমরা পরপর Synonyms লিখি, এই ছাড়া আর আগাইতে পারি না। আবার ভাবি মা দিদি মাসি বোন খুড়ী অনেক সম্পর্ক একই ব্যক্তি, কিন্তু ঐ শব্দগুলি সমার্থবাচক নহে, অথচ একই মানুষকে বুঝায়। ইহা আমি বিশ্বাস করি যে আমরা পৃথিবীর মহৎ সৌন্দর্য্য— সর্ব্ব আর্টের— বুঝিবার জন্য লিখি।

কমলকুমার মজুমদার। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা।
প্রশান্ত মাজী ও গৌতম মণ্ডল সংকলিত ও সম্পাদিত 'কমলকুমার মজুমদারের চিঠি'।

স ম্পা দ কী য়

মাঝেমাঝেই 'কালের কষ্টিপাথর'-এর বিলম্বিত প্রকাশ পাঠকের মতো আমাদের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃখের। এজন্য পাঠকের ক্ষোভও স্বাভাবিক ও সংগত।

বাংলা ভাষা ও সমাজে অধুনা অচল, কিন্তু একদা বাঙালির বহু গর্বের ধন সাহিত্যপত্রিকার ধারাটিকে আবার সচল ও স্রোতস্বিনী করা যায় কিনা সেই আশায় আমাদের এই উদ্যোগ— 'কালের কষ্টিপাথর'।

'সব ভালো পাঠ্যই আরও বেশি পাঠকের জন্য' —এই বিশ্বাসের উত্তেজনায় 'কালের কষ্টিপাথর' প্রথম কয়েক সংখ্যা পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করে শুধু অসফলই হইনি, নিরাশও হয়েছি। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠী ক্রমশই ছোট হয়ে আসার দুর্যোগাচ্ছন্ন নিয়তি আমি মন থেকে কখনও মেনে নিতে পারিনি, কিন্তু সমাজের সর্বত্র তারই সব লক্ষণ প্রস্ফুটিত দেখে একসময় আমরা পাক্ষিকের হাল ছেড়ে মাসিকের পালের তলায় আশ্রয় নিই। তখনও বুঝিনি বা হয়তো বুঝতে চাইওনি যে, সাহিত্যের আস্বাদ ও আশ্রয় বা শুশ্রূষায় বেশি মানুষের প্রয়োজন আর নেই। সাহিত্যের শাশ্বত মূল্য তাতে কণামাত্র কমবে না ঠিকই, কিন্তু সাহিত্যকে মূল্য দেবার মতো মানুষ নিশ্চয়ই কমবে। তা সত্ত্বেও এ দুঃখ তো থেকেই যায়, যা কালোত্তীর্ণ তা ক্রমশ আরও বেশি পাঠক প্রাণে টেনে নেবে না কেন! এমনও মনে হয়, ১৯৭৮-এর ২৪ ডিসেম্বর কমলকুমার মজুমদার যেমন লিখেছিলেন— '... যে শতাব্দীটা বাংলার প্রতিভা গড়িয়াছিল তাহা কেমনভাবে আমরা নষ্ট করিলাম ভাবিলে সত্যই কষ্ট হয়' —সেই দীর্ঘশ্বাস ক্রমশ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে না তো? এ-বছর তাঁর জন্মশতবর্ষে এ প্রশ্নও তাচ্ছিল্য করবার নয়।

এমন উদ্বেগজনক যুগপরিস্থিতিতেও হাল ছাড়বার কথা ভাবতে পারি না। সেই জেদে, প্রায় অসাধ্য জেনেও, স্থির হয়েছে যে ২০১৪-র জানুয়ারি থেকে 'কালের কষ্টিপাথর' প্রতি মাসের ১০ তারিখে প্রকাশিত হবে। প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ টাকা হলেও, আরও বেশি পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য এই জানুয়ারি থেকেই বার্ষিক গ্রাহকেরা এর অর্ধেক দামে নিয়মিত পত্রিকা পাবেন। ৬ জানুয়ারির মধ্যে ৩৬০ টাকার বদলে মাত্র ১৮০ টাকা পাঠিয়ে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা জানুয়ারি থেকেই সারা বছর অর্ধেক দামে পত্রিকা পাবেন।

বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি মাসের পত্রিকা সেই মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পিরিওডিক্যাল চ্যানেলে পোস্ট করা হবে।

পুরনো গ্রাহকেরা জানুয়ারি থেকে চাইলে তাদের অব্যয়িত গ্রাহকমূল্য ফেরত নিতে পারেন অথবা হিসাব মতো অর্ধেক মূল্যে আরও কয়েক সংখ্যা পত্রিকা পেতে পারেন।

আশা করি বাংলা ভাষায় ও বাংলার সমাজে এক সময়ের উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকাগুলির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কিছুটা অন্তত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাঠকের আন্তরিক সহযোগিতায় এই স্বার্থান্ধ, মিথ্যাচারপ্রবণ ঘোলাটে যুগেও সফল হবেই। কেননা সাহিত্যই মানুষের জীবনবোধের ভাঙন-গড়ন, বা হয়তো মানবচেতনার নিরন্তর স্মৃতি উদ্‌যাপন।

স্বর্ণাক্ষরে সংগ্রহযোগ্য

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই

তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

বকবকম

পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর

খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০

চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে

আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের

কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

কিশোর-উপন্যাস

দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান

আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।

যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। ₹১২০

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹৭৫

শাদা ঘোড়া

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।

পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে

ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

নবম মুদ্রণ ₹৪৫

গৌর যাযাবর

বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ₹১৫

ঋষিকুমার ₹২০

পাখির খাতা ₹৪০

আমার বনবাস ₹১২

তালগাছের ডোঙা ₹২০

হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

ভূতের বাঁশি ₹৪০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

নতুন বই

মৈত্রেয়ী নাগের

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

নেকড়ের চোখ

বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ** ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক খপে পাওয়া যায়

অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:

for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 Fax: 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ

বিচিত্র বিয়ে

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

কার্টুনিস্টের অপ্রিয় সত্যকথনের দায় আছে। পরছিদ্রান্বেষণের অপরাধে আমার কপালে নাচছে নরকযন্ত্রণা। সেই ঝুঁকি নিয়েই এক গরিবদরদি অখ্যাত মানুষের কথা বলে নিই।

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন 'লোকসেবক' সম্পাদক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের সহোদর। পঞ্চাশের দশক শুরু হয়েছে। দৈনিক 'লোকসেবক' ছিল একশ্রেণির গান্ধীবাদীদের কাগজ। কর্মচারীদের যথাসম্ভব শোষণ করে যাওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা ছিল এদের কয়েকজনের। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী পত্রিকা পরিচালনা করতেন একেবারে সামনে থেকে। ডাঃ ঘোষের দুই পালিতা কন্যা, রেণুকা ও সাধনা। সাধনার বিয়ে উপলক্ষে আমরা যারা লোকসেবকের চার মাসের বেতন না পাওয়া সাংবাদিক, তাদেরও নিমন্ত্রণ হল। পত্রিকা-মালিকের মেয়ের বিয়ে। সাব-এডিটর, রিপোর্টার সবাই চাঁদা দিলেন। ফান্ড তৈরি হল। আমার বেতন মাত্র আঠারো টাকা, তাও চার মাসের বাকি। অন্য সাংবাদিকরা কেউ কেউ পার্ট টাইম করেন। অন্য রোজগারের দৌলতে তাদের সংসার চলে।

ঠিক হল, সন্ধ্যার শিফটে যারা টেবিলে কাজ করবেন, তারা মালিক-কন্যার বিয়ের খাওয়াটা সেরে ফিরে আসবেন। তাঁরা এলে নাইট শিফটের সাংবাদিকরা বিয়ের ভোজ খেতে যাবেন। আমরা উপোসি ছারপোকা— বিয়ের ভোজ সত্যিই বড় একটা কপালে জোটে না।

আশুতোষ মুখার্জি রোড ও রাসবিহারীর জংশনের পূর্বদিকে

স্কুলবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে সত্যানন্দদাকে নেতা করে বিয়েবাড়ির দিকে আমরা আট-দশজন বুভুক্ষু সাংবাদিক রওনা হলাম। সঙ্গে উপহার-সামগ্রী। টেবিল ফ্যান, দামি বেনারসি শাড়ি, প্রসাধন দ্রব্যাদি, দামি পার্কার পেন। আমরা সাংবাদিকরা অতি সামান্য বেতন পেতাম, তাও চার মাসের বাকি। তবু হীনমন্যতায় ভুগতাম বলে বেশি দাম দিয়ে নামি কোম্পানির দ্রব্যাদিই কেনা হয়েছিল।

যথাসময়ে কালীঘাটের সেই প্রচুর আলোয় সজ্জিত বিয়েবাড়িতে আমরা পৌঁছলাম। আমরা সাংবাদিকরা প্রত্যেকে উপহারের প্যাকেটগুলি বিয়েবাড়ির অন্দরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে সাজানো চেয়ারে বসলাম। কত রকমারি আলো, বড় বড় গাড়ি আসছে-যাচ্ছে। আমি আঠারো টাকা বেতনের সাংবাদিক ক্যাবলার মতো ক্ষুধিত চোখ নিয়ে দেখছি না, গিলছি।

আমাদের নেতা সত্যানন্দ এক বান্ডিল বিড়ি ছাই করে তিন পাক ঘুরে এলেন। এক উর্দিধারী দারোয়ানকে বললেন, কীরে, খাবারের ডাক কখন পড়বে। আমাদের তো খবরের কাগজে নাইট ডিউটি আছে।

বিহারি দারোয়ান ভিতর থেকে এক পাক ঘুরে এসে জানাল— মালুম নেহি।

সত্যানন্দের ভ্রু কুঞ্চিত হল। সামনে পেলেন অন্নদা চৌধুরীর খদ্দরধারী পি এ-কে। সেই পি এ, সম্ভবত নাম নয়নানন্দ, খদ্দরের রুমালে মুখ মুছে নন্দিত নয়নে একবার নেত্রপাত করেই বললেন, খাওয়া? কীসের খাওয়া? আমরা গান্ধীবাদী। বিবাহকে পবিত্র বন্ধন বলেই মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, বিবাহে ভোজনজাতীয় ব্যাপারটা পয়সার অপব্যয়।

সত্যানন্দদা— তাহলে আমরা যে উপহার আনলাম, দিলাম!

গান্ধীবাদী— সে তো সবাই উপহার আনছেন, এক গ্লাস শরবত খেয়ে পাত্রী-আশীর্বাদ করে চলে যাচ্ছেন। পাত পেড়ে লোক খাওয়ানোয় গান্ধীবাদীরা বিশ্বাস করে না।

সত্যানন্দদা— যেমন হাসিখুশি মানুষ, চটলে অগ্নিশর্মা। কুমারটুলির ডানপিটে ছেলে। আমাকে ও আরও দু-চারজন সাংবাদিককে নিয়ে ভিড় ঠেলে সোজা কনের ঘরে হাজির হলেন। উপহার দেওয়া শাড়ির প্যাকেট, দামি সেন্টের বিলিতি সেট, বৈদ্যুতিক ল্যাম্প ও টেবিল ফ্যান সব তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কনে সাধনা হতচকিত। সত্যানন্দ বললেন— খাওয়া নেই তো উপহারও নেই। তোমার হাতের তিন গাছা চুড়ি আর ফেরত নিলাম না।

ট্যাক্সি ডেকে উপহার-সামগ্রী সব তুলে আমাদের নিয়ে সত্যানন্দদা 'লোকসেবক'-এ চলে এলেন। মুড়ি-তেলেভাজা এনে নিজে খেলেন এবং আমরাও খেলাম। নাইট ডিউটিতে কাজ শুরু করলেন।

এই সত্যানন্দ ভট্টাচার্যই পরবর্তীকালে কলকাতা পুরসভায় বিরোধী দলের নেতা হন। আরও পরে নকশালি রাজনীতির স্রষ্টা হিসেবে কারাবরণ করেন।

অনলাইনে কিনতে ▸ www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

ক্ষনের বচন

৯১

নলেন গুড়ের গন্ধ ঘরে ঘরে পেলে
সুখ ও শান্তির আশা ওড়ে ডানা মেলে

৯২

যত দূর নবান্নের ঘ্রাণ
তত সুর বাঁধে মন প্রাণ

৯৩

যতই বছর যাবে, বেড়ে যাবে ঋণ,
বছর বছর বাড়বে দঃখদাতা দিন।
মানুষের কালিমা যত ঢাকে চারিদিক
বেড়ে যায় ক্যালেন্ডারে শোকার্ত তারিখ।

৯৪

বড়ো লক্ষ্যে কেউ যদি মনোরথে চড়ে
ব্যর্থ লোকে দল বেঁধে দোষত্রুটি ধরে।
দ্রুতগামী সেই জন অহংকারী হলে
স্তাবকতা শুনে খুব সহজেই ভোলে।

৯৫

নিজ দোষ নিজ ভুল নিজ মুখে বলে
নিজেরই অজ্ঞাতে নিজে উঠবেই জ্বলে।

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৯১। হকবাজ

বিশেষণ; নিজের অধিকারের ব্যাপারে যিনি সদাই সচেতন > কোনও বাঙালির ছেলে কোথাও কেউকেটা হয়েছে শুনলে গোটা বাংলায় এমন উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায় কেন জানেন? বেশির ভাগই তো রকবাজ, অর্থাৎ ছোকরা বয়সটা রকে বসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। কেউ আবার মিটিং-মিছিল নিয়ে ভারি ব্যস্ত, তারা হল হকবাজ। এর ব্যতিক্রম বড় একটা চোখে পড়ে না।

৯২। মোছনারাত

বিশেষ্য; সকালে ঘুম ভাঙার পর যে রাতকে কোনও জাদুবলে জীবন থেকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে করে > ঈশানবাবুর জীবনে এমন একটা মোছনারাত আর কখনও আসেনি। প্রবল মাথাব্যথা নিয়ে বিছানা ছাড়তেই মনে পড়ে গেল গতরাতে সকলের সামনে তিনি গর্ব করে বলেছেন, তাঁর মতো প্রতিভাবান কবি এ মুহূর্তে দেশে খুব বেশি নেই। তিনি যে কবিতা লেখেন সে কথা কেউ জানত না দেখে ভারি বিরক্ত হয়ে সকলকে আজ নিজের বাড়িতে নেমন্তন্নও করেছেন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাবেন বলে। এখন দেখছেন, কী আশ্চর্য। জীবনের সব কবিতা তিনি কেবল স্বপ্নেই লিখেছেন।

৯৩। ভিড়টিগো

বিশেষ্য; ভিড়জনিত ভয় > আমার মামাবাবুটি খুব আমুদে মানুষ হলেও প্রবল ভিড়টিগোয় ভোগেন বলে পুজোর বাজার কোনওবারই আর করে উঠতে পারেন না।

৯৪। এপচয়

বিশেষ্য; ব্যাটারি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি কাজের জিনিস যখন আর ব্যবহার করা যায় না তখন তাদের যে নামে ডাকা হয় > জল, বিদ্যুৎ, কাগজ এমনকী কাপড়জামার ক্ষেত্রেও সবরকম অপচয় এড়িয়ে চলাই আমার বরাবরের অভ্যাস। বছর না ঘুরতেই এখনকার সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি যদি খারাপ হতে থাকে, তবে এই এপচয় রুধি কী করে?

৯৫। বিপ্রশ্রিত

বিশেষণ; শাসকদলের বিশেষ আদরে লালিত যে মুষ্টিমেয় লোকজন সরকার পাল্টে গেলেই শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

শব্দবক্রমুণি

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ৩১।

সৈয়দ মুজতবা আলি

আমরা, শান্তিনিকেতনীরা ডাকতুম সৈয়দদা। বাইরের সববাই বলতেন আলি সাহেব আর আত্মীয়স্বজনেরা সীতু মিঞা। অর্থাৎ তাঁর বাড়িতে ডাকনাম ছিল সিতারা। তাই থেকে সীতু। তিনিও তাঁর কবিতায় বলেছেন, জীব সীতু মিয়া ভনে।। সৈয়দ মুজতবা আলি ছিলেন এক অসাধারণ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবন পাল্টে দিয়েছেন।

সৈয়দদার জন্ম অসমের বঙ্গভাষী জেলা করিমগঞ্জে। শহরেই, নটী খালের বাড়িতে, তাঁর পিত্রালয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। বড় দুই ভাই সৈয়দ মুস্তাফা আলি ও সৈয়দ মুর্তাজা আলি— দু'জনেই ছিলেন কর্মে ও রচনায় খ্যাতিমান, দু'জনেরই স্মৃতিকথায় ছোট ভাইয়ের কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

সৈয়দদার বয়স যখন পাঁচ, তখন অসমের চিফ সেক্রেটারি তাঁর স্কুল পরিদর্শনে এসে বলেছিলেন, 'নেভার মাইন্ড হি উইল বি এ জিনিয়াস।' ক্লাস সেভেনে উঠে আরবি ফারসির বদলে সৈয়দদা নিয়েছিলেন সংস্কৃত। 'পাদটীকা' গল্পের সেই পণ্ডিত তো তাঁর নিজেরই মাস্টারমশাই। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় সিলেটের শহরে আরও দুজন হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে ইংরেজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে সরস্বতী পুজোর ফুল পাড়তে গিয়ে স্কুল থেকে রাসটিকেট হন। অন্য দু'জন হিন্দু ছাত্রের অভিভাবক ক্ষমা চাওয়ার জন্য অব্যাহতি পান কিন্তু সৈয়দদার বাবা সরকারি অফিসার হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা না চাওয়ায় সৈয়দদার ওই শাস্তি। স্কুল থেকে রাসটিকেট হওয়ার পর তিনি এক সাধারণ গেঞ্জিকলে সাধারণ চাকরি করতে লেগে গেলেন। এমন সময় অর্থাৎ ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ এলেন শ্রীহট্ট শহরে। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দেন। বিষয়— আকাঙ্ক্ষা। সৈয়দদা সেই বক্তৃতা শুনে এত অলোড়িত হন যে তাঁকে তিনি লিখলেন এক দীর্ঘ চিঠি। বক্তব্যের কিছু ব্যাখ্যা চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন আগরতলায়। সেখান থেকে অজ্ঞাত, অখ্যাত এক কিশোরের প্রশ্নাবলির উত্তর দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্র পেয়েই সেই কিশোরের বাসনা হয়, তিনি শান্তিনিকেতন যাবেন এবং সেইখানেই পড়াশোনা করবেন। তাঁর বড় দাদা সৈয়দ মুস্তাফা আলির সৌজন্যে তিনি শান্তিনিকেতন গিয়ে বিশ্বভারতী কোর্সে ভর্তি হন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বভারতীতে তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, মিলভাঁ লেভি, ভিক্টরশিপ কাদানান এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানে সমৃদ্ধ হয়ে আফগানিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি কাবুল পাড়ি দেন। সেখানকার বৃত্তান্ত তাঁর প্রথম বই 'দেশে বিদেশে' এবং সেই বইয়ে তিনি কাবুল-বৃত্তান্ত এমন অসাধারণ ভঙ্গী ও ভাষায় লেখেন যে, রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে যান লেখক হিসেবে। কাবুল থেকে ফিরে তিনি আলিগড় থেকে নেন সরকারি ডিগ্রি। তারপর জার্মানির 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট। মাঝে কিছুদিন মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করেছেন। দেশে ফিরে ফের বেকার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আই সি সি আর-এ কিছুদিন চাকরি, তারপর আকাশবাণীর ডিরেক্টর। কিছুদিন পরেই চাকরিতে ইস্তফা এবং পাকাপাকিভাবে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতন। সে

সৈয়দদাকে আমি প্রথম দেখি শান্তিনিকেতনে। ধুতি- পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন চেহারা।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি।

সৈয়দদাকে আমি প্রথম দেখি শান্তিনিকেতনে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন চেহারা। মাথায় টাক। যেন টাকের মুকুট পরা। থাকতেন প্রাককুটিরে। পরিমল গোস্বামী, অনাদিকুমার দস্তিদার, অনিলকুমার চন্দ এবং চিত্রশিল্পী হরিপদ রায়ের সঙ্গে আলাদা আলাদা ঘরে একই বাড়িতে। ইতিমধ্যেই 'টেকচাঁদ' ও 'সত্যপীর' ছদ্মনামে তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। জার্মান সঙ্গীতেও ভাগনার সম্পর্কে তাঁর একটি অসাধারণ রচনা বেরিয়েছিল সেকালের শনিবারের চিঠিতে।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন। নিজে আড্ডাবাজ লোক। সাইকেলে চড়ে এ বাড়ি সে বাড়ি এবং কালোর দোকানে আড্ডা মারতে রোজ যেতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কিছুদিন বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মেজদাদা সৈয়দ মুর্তাজা আলি তখন বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সৈয়দদা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। সেখানে এক সাহিত্যসভায় তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চেয়ে বড় কবি। মৌলবাদী ছাত্ররা তাঁকে মারতে আসে। তিনি কোনওক্রমে দাদার বাংলোয় দৌড়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান।

'দেশে বিদেশে' বইয়ে তিনি কাবুল-বৃত্তান্ত এমন অসাধারণ ভঙ্গি ও ভাষায় লেখেন যে, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান।

তারপরই তিনি আমৃত্যু ছিলেন ভারতের নাগরিক। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রেরা থাকতেন পূর্ব পাকিস্তানে। মাঝে মাঝে তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে থাকতেন বাবার কাছে, স্বামীর কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা ১৯৬৫ সালে একদল স্বার্থান্বেষী লোক তাঁকে পাকিস্তানের চর বলে সন্দেহ করে। অকারণে। সেই দুঃখে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে বোলপুরে এসে থাকতে শুরু করেন।

তারপর কলকাতায়। পার্ল রোডে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

তিনি তখন অসুস্থ। ঘন ঘন কাশছেন আর কথা বলছেন। হাতের কলম সরে না, লিখতে কষ্ট হয়। কিছুদিন পর ঢাকা যান। সেখানেই ৭০ বছর বয়সে একটি রবীন্দ্রপ্রিয় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: **2283-2320** Fax: **2287-6448** E-Mail: **info@swarnakshar.in**

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, *বলাকা বুক স্টল* (কলেজ স্ট্রিট),
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

সতেরো

৩১ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

আজ ফখরুজ্জামান বিলেত রওনা হবে। প্লেন দুপুরের পরে। সকাল নটায় আঞ্জুকে পরীবাগের শাহ সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছি ফখরুর জন্য দোয়া চাইতে। তারপর আবার সাড়ে দশটায় মা ও লালুকে নিয়ে গিয়েছি গুলশানে, ফখরুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আঞ্জুও যাচ্ছে ফখরুর সঙ্গে। ছেলেমেয়েরা দেশেই থাকবে ওর মা'র কাছে।

দুপুরে শরীফ বাসায় ফিরল মুখ কালো করে, 'শুনছো, খুব খারাপ খবর। খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে মারা গিয়েছে।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল, 'কী সর্বনাশ! কার কাছে শুনলে?'

'বাঁকার কাছে। বাঁকা খুব ভেঙে পড়েছে।'

আমাদেরও ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। একী নিদারুণ সংবাদ! একী সর্বনাশ হল! খালেদ মোশাররফ নেই, যুদ্ধে মারা গিয়েছে?

রুমীদের গ্রেপ্তারের ধাক্কা একটু একটু করে কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছি, ঢাকার বুকে গেরিলাদের বিভিন্ন অ্যাকশান মনের মধ্যে একটু একটু করে আশার সঞ্চার করছে— এর মধ্যে আবার একী বিনামেঘে বজ্রপাত!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দোতলায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম খালেদেরই কথা।

এই খালেদ— ক্র্যাকডাউনের সময়ই তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে তার পাঞ্জাবি বস তাকে কুমিল্লা থেকে সিলেটে পাঠিয়েছিল, কিন্তু আয়ু ছিল খালেদের, দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি খাটিয়ে সে নিশ্চিত মৃত্যুর ছোবল এড়ায় সে-যাত্রা। এড়িয়ে, সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, পিছনে ঢাকায় পড়ে থাকে তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, ফুলের মতো ফুটফুটে দুটি মেয়ে। সে জানতও না, ২৫ মার্চের কালরাত্রে পাক বর্বরবাহিনী তার শ্বশুরবাড়ি তছনছ করে দিয়েছিল; শ্বশুর, শাশুড়ি, বড় শ্যালী, ভায়রাভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে জানত না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পাক হানাদারের হাত এড়াতে একেকদিন একেকজনের বাড়িতে লুকিয়ে থাকছিল। কিংবা সত্যি কি সে জানত না? সে নিশ্চয় জানত এরকমটাই ঘটবে তার পরিবার-পরিজনদের জীবনে। তা জেনেই সে তাদেরকে পিছনে ফেলে সামনের পথ ধরে চলে গিয়েছিল অনিশ্চয়ের দিকে। সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে সে পালিয়ে আসা বিদ্রোহী বাঙালি সামরিক বাহিনীর অফিসার জওয়ান আর যুদ্ধকামী শত শত যুবক-কিশোরদের জড়ো করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার দুরূহ কাজে মগ্ন হয়েছিল।

ঢাকা থেকে তার ফ্যামিলির খবর প্রথম

সে পায় তার বন্ধুর ছোট ভাই শহীদুল্লাহ খান বাদলের মারফত। বাদল এবং তার তিন বন্ধু আসফাকুস সামাদ (অ্যাসফী), মাসুদ ও বদি ২৭ মার্চেই ঢাকা ছাড়ে, তাদের বিশ্বাস হয় পাক আর্মির এতবড় ক্র্যাকডাউনের পর নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। তারাও যোগ দিতে চায় সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে। তারা 'যুদ্ধের' খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। তারা তখনও জানত না খালেদ মোশাররফ কোথায় আছে। কিন্তু পথে নানাজনের সঙ্গে দেখা হতে হতে এবং নানা ঘটনা ঘটতে ঘটতে শেষমেষ খালেদ মোশাররফের সঙ্গেই তাদের যোগাযোগ ঘটে যায়।

খালেদ বাদলকে বলে 'এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হবে। এর জন্য দরকার রেগুলার আর্মির পাশাপাশি গেরিলা বাহিনী। তুমি ঢাকায় ফিরে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। যারা আসতে চায়, মুক্তিযুদ্ধ করতে চায়, তাদের এখানে পাঠাতে থাক।'

খালেদ আরও বলে, 'যুদ্ধ হবে তিন ফ্রন্টে-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক। সামরিক ফ্রন্টের জন্য রয়েছে নিয়মিত সেনাবাহিনী, অন্য দুটি ফ্রন্টের জন্য প্রয়োজন সারাদেশের তরুণ সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, সাংবাদিক— সকল স্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষ। তাদেরকেও এখানে নিয়ে আসতে হবে।' এই দিকটার সংগঠনের পুরোপুরি ভার খালেদ মোশাররফ বাদলের ওপরই দেয়। এস এস সি ও এইচ এস সিতে ফার্স্ট হওয়া অসাধারণ মেধাবী ছেলে বাদল নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ একপাশে ঠেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিশ্চিত মুক্তিযুদ্ধের সংগঠনের কাজে।

খালেদ মোশাররফের পরামর্শ এবং প্রেরণাতেই বাদল বারেবারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা এসেছে। বন্ধু অ্যাসফী সামাদের সহায়তায় সংগঠিত করেছে ঢাকার তরুণদের— যারা 'যুদ্ধে' যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, অথচ পথ পাচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে পথের নির্দেশ নিয়ে একে একে ছোট ছোট দলে ওপারে গিয়েছে কাজি, মায়া, ফতে, পুলু, গাজি, সিরাজ, আনু ও আরও অনেকে। গিয়েছে শাহাদত চৌধুরী, আহরার আহমদ, ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন সালেক, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের কাদের, এ আর খোন্দকার, সুলতান মাহমুদ। গিয়েছে পি আই এ'র পাইলট ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার, ক্যাপ্টেন শাহাব এবং এরকম আরও বহুজন।

> যুদ্ধ হবে তিন ফ্রন্টে-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক। সামরিক ফ্রন্টের জন্য রয়েছে নিয়মিত সেনাবাহিনী, অন্য দুটি ফ্রন্টের জন্য প্রয়োজন সারাদেশের তরুণ সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, সাংবাদিক— সকল স্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষ।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বাদল খালেদ মোশাররফের স্ত্রী রুবী ও তার মাকে ঢাকা থেকে নিয়ে খালেদের কাছে পৌঁছে দেয় অনেক কষ্ট করে। যাওয়ার সময় পথে ঘোড়াশালে ও ভৈরববাজারে পাক বিমানবাহিনীর বম্বিং ও স্ট্রেফিংয়ের মধ্যে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে, পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে অবশেষে একদিন রুবী পৌঁছে যায় খালেদের কাছে। কিন্তু মেয়ে দুটি রয়ে যায় ঢাকাতে। রুবীর ভাই দীপুর বন্ধু মাহমুদের বাসায় ছিল মেয়েরা। পাক আর্মি দীপু ও মেয়ে দুটিকে ধরে ফেলে। তারপর সামরিক কর্তৃপক্ষ অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস মিসেস আনোয়ারা মনসুরের হেফাজতে রেখে দেয় খালেদ মোশাররফের মেয়ে দুটিকে।

মেজর খালেদ মোশাররফের স্ত্রীকে ঢাকা থেকে পার করে দেওয়ার অপরাধে সামরিক সরকার হুলিয়া বের করে বাদলের নামে। তবুও এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েই বাদল কিছুদিন পর আবার ঢাকা আসে। এবার তার কাজ খালেদের মেয়ে দুটিকে নিয়ে বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দেওয়া। খুব কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। আনোয়ারা মনসুরের বাসা হল এলিফ্যান্ট রোডে 'নাশেমন' সরকারি ভবনে, তিনতলার ফ্ল্যাটে। সেখান থেকে দুটি বাচ্চা হাইজ্যাক করে আনা বড় সহজ কাজ নয়। বাদলের এ কাজে তার সঙ্গী হল বদি, কাজি, স্বপন ও চুল্লু। চুল্লু নীচে গাড়িতে বসে রইল স্টার্ট দিয়ে। বাকি চারজন অস্ত্রসহ তিনতলায় উঠে গেল। কিন্তু দুটি মেয়েকেই নিয়ে আসতে পারল না ওরা। আনোয়ারা মনসুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বাড়ির অন্য কেউ একজনকে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে স্বপন পিস্তলের একটা ফাঁকা গুলি ছোড়ে দেয়ালে। তারপরই হুলস্থুল লেগে যায়। আনোয়ারা মনসুরের বড় বোন ছুটে আসলে একজন তার পায়ের দিকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে। গুলি পায়ের চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আনোয়ারা মনসুরের মাথায় স্টেনের বাঁটের আঘাত লাগে। বড় মেয়ে বেবী বাদলকে চিনত, কিন্তু ছোটটি চিনত না। মিসেস মনসুর ছোট মেয়ে রুপনকে বুকে জাপটে ধরে বসেছিলেন। গুলির পর বাদলরা ওখানে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করেনি। বাদল বেবীকে তুলে নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে নীচে নেমে আসে। দেখে, গাড়ির কাছাকাছি লোক জমে যাচ্ছে। বদি প্রচণ্ড ধমকে কয়েকজনকে ঘাবড়ে দেয়। ওরা দ্রুত গাড়িতে উঠে উধাও হয়ে যায়। শহরে আর কোথাও দাঁড়ায়নি। গোপীবাগে গিয়ে এক জায়গায় চুল্লু ওদের নামিয়ে দেয়। বাদল আর কাজি বেবীকে নিয়ে মানিকনগর দিয়ে গিয়ে দাউদকান্দি হয়ে পথে অনেক বিপত্তি পেরিয়ে তারপর খালেদ মোশাররফের ক্যাম্পে পৌঁছয়।

এত সবের মধ্যেও খালেদ মোশাররফ মাথা ঠান্ডা রেখে মুক্তিযুদ্ধের কাজ চালিয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে দু নম্বর সেক্টর, মেলাঘর তার হেডকোয়ার্টার্স। নিয়মিত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বিরাট গেরিলা বাহিনী। দেশের অন্য সব জায়গা থেকে তো বটেই, বিশেষ করে ঢাকার যত শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, টগবগে, বেপরোয়া ছেলে, এসে জড়ো হয়েছে এই সেক্টর টুতে। খালেদ মোশাররফ কেবল

তাদের সেক্টর কম্যান্ডারই নয়, খালেদ মোশাররফ তাদের হিরো। যতগুলো ছেলে সেক্টরে রাখার অনুমতি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে আশ্রয় দিত খালেদ। নির্দিষ্টসংখ্যক ছেলের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশন দুগুণ বেশি ছেলেরা ভাগ করে খেত। খালেদ বলত, 'ঢাকায় গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য আমার প্রচুর ছেলে দরকার। অথচ আওয়ামী লীগের ক্লিয়ারেন্স, ইউথ ক্যাম্পের সার্টিফিকেট বা ভারত সরকারের অনুমোদন পেরিয়ে যে কয়টা ছেলে আমাকে দেওয়া হয়, তা যথেষ্ট নয়।' তাই খালেদ বাদলকে বলত, 'যত পার, সরাসরি ছেলে রিক্রুট করে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই যুদ্ধ আমাদের জাতীয় যুদ্ধ। দলমতনির্বিশেষে যারাই দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসবে, তাদের সবাইকে আমি সমানভাবে গ্রহণ করব।'

বাদলরা তাই করত। ফলে, খাতায় যত ছেলের নাম থাকত, তার চেয়ে অনেক বেশি ছেলেকে খালেদ ক্যাম্পে রেখে গেরিলা ট্রেনিং দিয়ে ঢাকা পাঠাবার জন্য তৈরি করত। তিনশো ছেলের রেশন ছয়শো ছেলে ভাগ করে খেত। হাত খরচের টাকাও এভাবে ভাগ হয়ে একেকটি ছেলে পেত মাসে এগারো ইন্ডিয়ান রুপি।

বহু ছেলে যুদ্ধ করার উন্মাদনায় আগরতলা এসেও কোথাও ট্রেনিং নিতে পারছিল না, বসে বসে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। খালেদ মোশাররফ এভাবে ভারত সরকারের নাকের ডগায় লুকিয়ে বেশি বেশি স্বাধীনতাকামী যুদ্ধকামী ছেলেদেরকে তার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করার পলিসি না নিলে ঢাকার গেরিলা তৎপরতায় এত সাফল্য আসত কি না, এরকম অব্যাহত গতি বজায় থাকত কি না, সন্দেহ। ২৯-৩০ আগস্টে এত বেশিসংখ্যক গেরিলা ধরা পড়ার পরও মাত্র দেড়-দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রচুর, অজস্র, অসংখ্য গেরিলা ঢাকায় বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে ঢুকেছে, অ্যাকশান করছে, পাক আর্মিকে নাস্তানাবুদ করছে, সামরিক সরকারের ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছে, অবরুদ্ধ দেশবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছে— এটাও সম্ভব হচ্ছে খালেদেরই দূরদর্শিতার জন্য। আসলে খালেদ স্বপ্নদ্রষ্টা। খালেদ শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। বাংলাদেশের জন্য যা ভালো মনে করেছে, তাই কাজে পরিণত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এক্ষেত্রে সে আওয়ামী লীগের বা ভারত সরকারের নির্দেশ বিধিনিষেধের ধার ধারেনি। তার এই সাহস, দুঃসাহস, আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যতের দিকে নির্ভুল নির্ভীক দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা তাকে সেক্টর টু'র গেরিলা ছেলেদের কাছে করে তুলেছে অসম্ভব জনপ্রিয়। প্রায় দেবতার মতো। খালেদের যে কোনও হুকুম চোখ বন্ধ করে তামিল করার জন্য প্রতিটি গেরিলা ছেলে একপায়ে খাড়া। খালেদ মোশাররফ সেক্টর টু'র প্রাণ।

সেই খালেদ মোশাররফ যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয়েছে? নিঃসন্দেহে তার জন্য গৌরবের মৃত্যু, শহিদের সম্মান পেয়েছে সে। কিন্তু সেক্টর টু'র জন্য? মেলাঘরের উদ্দাম, দুঃসাহসী গেরিলা বাহিনীর জন্য? ঢাকায় অবরুদ্ধ আমাদের জন্য? আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর কী হতে পারে?

খালেদের মৃত্যুসংবাদে মনের মধ্যে রুমীর শোক দ্বিগুণ উথলে উঠল। মেলাঘর থেকে ফেরার পরে রুমী কত যে খালেদের গল্প বলত। খালেদই তো ছেলেদের বলত 'কোনও স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। চায় রক্তস্নাত শহিদ।' তাই কি খালেদ

২৯-৩০ আগস্টে এত বেশিসংখ্যক গেরিলা ধরা পড়ার পরও মাত্র দেড় দুই সপ্তাহের ব্যবধানে প্রচুর, অজস্র, অসংখ্য গেরিলা ঢাকায় বিভিন্ন দিক দিয়ে শহরে ঢুকেছে, অ্যাকশান করছে, পাক আর্মিকে নাস্তানাবুদ করছে, সামরিক সরকারের ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছে, অবরুদ্ধ দেশবাসীর মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছে—

সঙ্গের ছবিতে দোলুরায় মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিক্ষেত্রের চূড়া

আজ শহিদ? লক্ষ লক্ষ ছেলেকে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়ে খালেদ কোথায় চলে গেল?

দূরে একটা গ্রেনেড ফাটল। কোনও এক রুমী, এক বদি, এক জুয়েল, এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্নে মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে কোথাও আঘাত হানল। স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খালেদ মোশাররফের হাতে গড়া গেরিলারা। ওই ছেলেরা কি জানে, ওদের নেতা আর নেই?

খালেদ নেই, রুমী নেই, বদি নেই, জুয়েল নেই কিন্তু যুদ্ধ আছে— স্বাধীনতার যুদ্ধ।

৩ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

আজ সারাদিন কারেন্ট নেই। কোথায় যে কী হয়েছে এখনও কোনও খবর কারও কাছে পাইনি। লুলুটা খবর আনার ব্যাপারে খুব করিতকর্মা। তাকে আমরা সবসময় 'গেজেট' বলে ডাকি, তারও আজ পাত্তা নেই।

৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

দিনগুলো কেমন যেন নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ হয়ে কাটছে। বেশি কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। ফোনে মিনির সঙ্গে কথা বলি, রেজিয়ার সঙ্গে বলি, ডলির সঙ্গে কথা বলি। খালেদ মোশাররফের খবরে সবাই মর্মাহত। মিনির কাছে জেনেছি, খালেদের মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র ঢাকায় গেরিলাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকেই দুজন করে গেরিলা মেলাঘরে ছুটে গিয়েছে খবরাখবর জানবার জন্য। আশা করা যাচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেই আমরা বিস্তারিত খবর জানতে পারব।

খালেদের মৃত্যু-সংবাদে গেরিলাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেলেও কেউ মনোবল হারায়নি, তা বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রতিদিনের অ্যাকশানে। বরং বলা যায়, তারা যেন খালেদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরও রুখে, আরও মরিয়া হয়ে, একটার পর একটা অ্যাকশান করে চলেছে।

জোনাকি সিনেমা হলের পাশে যে পলওয়েল মার্কেট আছে, গতকাল সেখানে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে বিচ্ছুরা টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে। এগারোটার সময় প্রকাশ্য দিবালোকেই একই দিনে মৌচাক মার্কেটে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তিন-চারজন বিচ্ছু ঢুকে সাত হাজার টাকা নিয়ে যায়। ওটাও

জোনাকি সিনেমা হলের পাশে যে পলওয়েল মার্কেট আছে, গতকাল সেখানে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে বিচ্ছুরা টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে। এগারোটার সময় প্রকাশ্য দিবালোকেই একই দিনে মৌচাক মার্কেটে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তিন-চারজন বিচ্ছু ঢুকে সাত হাজার টাকা নিয়ে যায়।

ওই এগারোটা-সাড়ে এগারোটার দিকেই প্রকাশ্য দিবালোকে।

খবর কাগজেই বেরিয়েছে এসব ব্যাঙ্ক লুটের কাহিনি। খবর কাগজে আরও বেরিয়েছে: ১ নভেম্বর প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশন অফিসে বোমা বিস্ফোরণে একজন নিহত, দু'জন আহত, দুটো ঘর বিধ্বস্ত, ছাদ ধসেছে, বোমার আগুনে কাগজপত্র পুড়ে ছাই। ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় কাকরাইল পেট্রল পাম্পের ওপর গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। রাত আটটায় আজিমপুরে আর্মি রিক্রুটিং কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে।

আজ বিকেলে পাগলাপিরের আস্তানায় সাপ্তাহিক মিলাদ। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। ঠিক করেছি মিষ্টিসহ জামীকে পাঠিয়ে দেব। জামীর খুব আপত্তি নেই। কারণ শিমুলদের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই এক পায়ে খাড়া থাকে ও বাড়িতে যাওয়ার জন্য।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলার পর খুব ঝরঝরে লাগল। কারণ এখন আর কোনও তাড়াহুড়ো নেই আমার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বারোটা বাজে।

বেশ আয়েশ করে এককাপ চা নিয়ে বসেছি, হঠাৎ দরজায় বেল। জামী খুলে দিতেই হাসিমুখে ঘরে ঢোকে মিনি। ঢুকেই কলকল করে বলে উঠল, 'চাচি, সুখবর। খালেদ মোশাররফ মারা যায়নি। যুদ্ধে সাংঘাতিক জখম হয়েছে। কিন্তু বেঁচে আছে।'

খালেদ মোশাররফ বেঁচে আছে!

খোদা! তুমি অপার করুণাময়।

আমি মিনিকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, 'কার কাছে শুনলে? সব খুলে বলো।'

মিনি বলল।

ঢাকা থেকে যেসব মুক্তিযোদ্ধা মেলাঘরে ছুটে গিয়েছিল, তাদের দু'একজন ফিরে এসেছে। তাদের কাছ থেকে মিনি শুনেছে: যুদ্ধ করার সময় শত্রুপক্ষের শেলের একটা স্প্লিন্টার খালেদের কপালে লেগেছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে লখনউয়ে। এর বেশি কিছু মিনি শোনেনি।

মিনিদের বাড়িটাই গেরিলাদের একটা আস্তানা। ওরা চাচাতো, খালাতো, পাড়াতুতো ভাইরা মুক্তিযোদ্ধা, তারা এবং তাদের সুবাদে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে। সৌভাগ্যবশত ওদের বাড়িতে পাক আর্মির হামলা হয়নি, তাই গেরিলারা এখনও নিঃশঙ্কচিত্তে আসতে পারে ওদের বাড়িতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডি আই টি বিল্ডিংয়ে কারা ব্লাস্ট করেছে, জানো?'

মিনির একটা বৈশিষ্ট্য হল, কথায় কথায় ঝরঝর করে হাসা। হেসে বলল, 'ওমা চাচি— ওতো আমাদের জন আর ফেরদৌস।'

'বল কী? ওই স্কুলের ছেলে দুটো? ওইরকম কড়া সিকিউরিটি কাটিয়ে? কী করে করল?'

'ওদের কথা আর বলবেন না। ওরা যা বিচ্ছু। অনেকদিন থেকে ওরা পাঁয়তারা কষছিল কী করে ডি আই টি বিল্ডিংয়ের ভেতরে ব্লাস্ট করা যায়। ডি আই টি' তে কাজ করে এক ভদ্রলোক, নাম মাহবুব আলী, সে আবার টিভি'তে নাটকে অভিনয়ও করে— ওই যে সুজা খোন্দকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে গুরু-শিষ্য বলে একটা হাসির প্রোগ্রাম করে— ওই মাহবুব। সে জন

আর ফেরদৌসকে খুব সাহায্য করেছে। ওদেরকে ভিতরে ঢোকার পাস জোগাড় করে দিয়েছে। নিজের পায়ে নকল ব্যান্ডেজ লাগিয়ে তার ভিতর পি কে নিয়ে গিয়েছে ডি আই টি'র সাততলায়। সাততলায় ওই রুমটাতে মেলাই পুরনো ফাইল গাদি করে রাখা হত। ওইসব ফাইলের গাদির ভিতর ওই পি কে লুকিয়ে রাখত।'

'মাহবুব আলীর খুব সাহস তো?'

'সাহস বলে সাহস? তাও একদিন তো নয় বারোদিন ধরে রোজ একটু একটু করে পি কে পায়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। দিনে এক পাউন্ডের বেশি নেওয়া যেত না, তাহলে ব্যান্ডেজ বেশি মোটা হয়ে গেলে পাক আর্মির সন্দেহ হবে। জন-ফেরদৌসের প্ল্যান ছিল আরও বড়। ডি আই টি টাওয়ারের ওপর যে টি ভি অ্যান্টেনা টাওয়ার আছে, ওটা ব্লাস্ট করা। এর জন্য দরকার ছিল ষোলো পাউন্ড পি. কে. ভেতরে নেবার। কিন্তু বারো পাউন্ড নেবার পর হঠাৎ ওরা শুনল সাততলায় ওই ঘরের ফাইলপত্র সরিয়ে ঘরটা গোছানো হবে। অমনি ওরা ভয় পেয়ে গেল। ফাইলের পিছনে লুকনো পি কে একবার ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ডি আই টি বিল্ডিংয়ের তাবৎ বাঙালির জান তো যাবেই, ভবিষ্যতে আর কোনওদিনও ডি আই টির ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। তাই জন, ফেরদৌস আগেই অপারেশন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। একটু অন্যরকম হবে। তা কী আর করা। তবু ওদের ব্লাস্ট করা চাই-ই। কারণ দুনিয়াকে ওরা দেখাতে চায় পাক আর্মির সিকিউরিটি দুর্ভেদ্য নয়; পাক আর্মির অত্যাচারের চাপে হাঁসফাঁস করেও বাঙালিরা একেবারে মরে যায়নি। ওরা মাহবুব আলীর ব্যান্ডেজের মধ্যে ছ-ফুট সেফটি ফিউজ দিয়ে দিল; আর একটা ফাউন্টেন পেনের ভিতরটা খালি করে তার মধ্যে একটা ডিটোনেটার ভরে দিল। মাহবুব আলী এগুলো ভেতরে নেবার সময় প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। অন্যদিন পুলিশ শুধু সার্ট-প্যান্টের পকেট চেক করে। সেদিনের পুলিশটা হঠাৎ কী মনে করে মাহবুবের কোমর, উরু-হাঁটু এগুলোও চেক করা শুরু করল। মাহবুবের তখন যা অবস্থা! পুলিশটা আর এক ইঞ্চি নীচে হাত দিলেই ওর পায়ের ব্যান্ডেজ বুঝে ফেলত। কিন্তু মাহবুবের কপাল ভালো— পুলিশটা ওই পর্যন্ত দেখেই ক্ষান্ত হয়েছিল। মাহবুব, জন আর ফেরদৌসকে অভিশান দেবার দুটো পাস জোগাড় করে দিয়েছিল। ওরা সেই পাস নিয়ে ডি আই টি বিল্ডিংয়ে ঢুকে অপারেশন করে বেরিয়ে আসে।'

দুনিয়াকে ওরা দেখাতে চায় পাক আর্মির সিকিউরিটি দুর্ভেদ্য নয়; পাক আর্মির অত্যাচারের চাপে হাঁসফাঁস করেও বাঙালিরা একেবারে মরে যায়নি। ওরা মাহবুব আলীর ব্যান্ডেজের মধ্যে ছ-ফুট সেফটি ফিউজ দিয়ে দিল; আর একটা ফাউন্টেন পেনের ভেতরটা খালি করে তার মধ্যে একটা ডিটোনেটার ভরে দিল।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'উঃ, বলতে কী সহজ। কিন্তু ওরা যখন কাজটা করেছিল, তখন মোটেই সহজ ছিল না।'

তাতো ছিলই না। ঘাপলাও কি কম হয়েছিল চাচি? এখন তো প্রত্যেক তলায়-তলায় সিঁড়ির মুখে চেকপোস্ট; ছতলা পর্যন্ত চেকপোস্টের পুলিশ ওদের ছেড়ে দিল। সাততলায় যাবার সিঁড়ির পুলিশটা বোধহয় একটু বেয়াড়া ছিল। সে তো জেরা করা শুরু করল 'কেন যাবে? কার কাছে যাবে? কী কাজ?' জন আর ফেরদৌস তো কম বিচ্ছু নয়। ওরা খুব ডাঁটে বলল, 'আরে, আমরা সরকারি অফিসের লোক। সরকারের জরুরি কাজে ওপরে যাচ্ছি। তুমি আমাদের আটকালে সরকারের কাজের ক্ষতি হবে। আমাদের কী? আমাদের পাঠানো হয়েছে, বুড়িগঙ্গার পানি কতটুকু বেড়েছে, তা টাওয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করার জন্য। দেখছ না, কদিন থেকে কী বৃষ্টি? এ বছর এত বৃষ্টির জন্যই তো দেশে এত বন্যা, এত ঝুট-ঝামেলা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো না ওই যে মাঠঘাট কেমন পানিতে ডুবে গিয়েছে।' ওদের লম্বা বক্তৃতার ফাঁকে ওদের পিছনে আরও লোক এসে জমা হয়েছে ওপরে যাওয়ার জন্য, তাদেরকেও চেক করতে হবে। পুলিশটা তো ওয়েস্ট পাকিস্তানি— জানেন তো ওরা কীরকম বুদ্ধু হয়— জনের কথার তোড়ে দিশেহারা হয়ে বলে 'আচ্ছা, আচ্ছা যাও।'

মিনি হাসতে হাসতে কথা বলছিল, এখন হাসি এত বেড়ে গেল যে কথা থামাতে হল। আমি আর জামীও খুব হাসলাম। সত্যি বলতে কী, খালেদের মিথ্যে মরার খবর শোনার পর এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসলাম। একটু পরে হাসি থামিয়ে বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী? ওরা সাততলায় সেই ঘরে গিয়ে যা যা করা দরকার— সবটা পি কে একত্রে টাল করা, ফিউজওয়ার লাগানো, ডিটোনেটার ফিট করা— সব দু'জনে মিলে করে, ফিউজওয়ারের মুখে আগুন ধরিয়ে এল। ফিউজওয়ার পুড়িয়ে ব্লাস্ট হতে তিন মিনিট লাগবে, এই সময়ের মধ্যে ওদেরকে ডি আই টি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে বেরতে না পারলে ওরা আটকা পড়ে যাবে। কারণ ব্লাস্ট হওয়া মাত্রই তো আর্মি পুরো বিল্ডিং ঘিরে ফেলবে, কাউকে বেরতে দেবে না। তিন মিনিটে সাততলা থেকে নেমে রাস্তায় বেরনো কি চাট্টিখানি কথা চাচি? দৌড়োতেও পারে না, পুলিশ দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। আবার হেঁটে গেলেও সারতে পারবে না। তাই যেখানে কেউ নেই, সেখানে ওরা দৌড় দেয়, আবার পুলিশ দেখলে ভালো মানুষের মতো মুখ করে হাঁটে। ওদের কপাল ভালো, ব্লাস্ট হওয়ার আগের মুহূর্তে ওরা বেরিয়ে যেতে পেরেছিল।'

আমি আবারও নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'বড্ডো বেপরোয়া ওরা। আল্লা বাঁচিয়েছেন ওদের। বাঘের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।'

মিনি বলল, 'চাচি, কাল আমাদের ওদিকে সারাদিন কারেন্ট ছিল না। আপনাদের এ-দিকে?'

'এদিকেও ছিল না। ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। চৌদ্দো ঘণ্টা। জানো কালকেই প্রথম টিউবওয়েলটা ব্যবহার করতে পারলাম। ওটা বসানোর পর একদিনও কারেন্ট যায়নি। বড্ডো দুঃখ ছিল মনে— পয়সাগুলো গচ্চা গেল।'

মিনি আবার হেসে কুটিকুটি হল, 'কাল কিছুটা উসুল হল তাহলে?'

'তা হল। কিন্তু কারা কোথায় কী করল, তা তো জানতে পারলাম না।'

জামী খাবার টেবিলে বসে খবর কাগজগুলো ওল্টাচ্ছিল, সে বলল, 'কেন? কাগজে বেরিয়েছে, দেখনি?'

'তাই নাকি? কী লিখেছে?' জামী পড়ল, 'সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউসে বোমা বিস্ফোরণ।'

গতকাল বুধবার ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউসে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে পাওয়ার হাউসের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং চারটি জেনারেটরই বিকল হয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও শহরতলি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।' শুনতে শুনতে আমি উদাস হয়ে গেলাম। রুমীরা এই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ওড়াবার প্ল্যান নিয়ে মেলাঘর থেকে ঢাকা এসেছিল। তারা তা করবার আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল। রুমী, বদি, জুয়েল চিরতরে হারিয়ে গেল। কিন্তু রুমীদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আরও অনেক রুমী, অনেক বদি, অনেক জুয়েল সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

৭ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

আজ ডলির বাসায় দেখা হল নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর সঙ্গে। ওর কাছে শুনলাম খালেদ মোশাররফ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত খবর।

খালেদের মৃত্যুর খবর ওদের বেস ক্যাম্পে এসে পৌঁছয় অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কারবালার মাতম পড়ে যায় ছেলেদের মধ্যে। এইসব দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা তাদের স্বপ্নের নায়ক বীর নেতার মৃত্যুসংবাদে একেবারে ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গেরিলা ছেলেকে মেলাঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিস্তারিত খবর আনার জন্য। গতকালই তারা ফিরেছে

রুমী, বদি, জুয়েল চিরতরে হারিয়ে গেল। কিন্তু রুমীদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আরও অনেক রুমী, অনেক বদি, অনেক জুয়েল সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সব খবরাখবর নিয়ে।

কসবা যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় খালেদ মোশাররফ জখম হয়েছে। শেলের স্প্লিন্টার খালেদের কপালে ফুটো করে মগজের ওপরদিক ঘেঁষে লেগেছে। অবস্থা খুব গুরুতর তবে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠবে, আশা আছে। লখনউ শহরে যে হাসপাতালে খালেদকে নেওয়া হয়েছে, সেটা খুবই উন্নতমানের হাসপাতাল।

খালেদের আহত হওয়ার খবরে মেলাঘরে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। সবাই ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে। বহু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ম ভেঙে ক্যাম্প ছেড়ে আগরতলার দিকে ছুটে যায় খালেদের খবর নেওয়ার জন্য। খালেদ মোশাররফ মেলাঘরের ছেলেদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। খালেদ শুধু তাদের সেক্টর কমান্ডার নয়, সে তাদের গার্ডিয়ান এঞ্জেল। তবে এত বড় সর্বনাশের মধ্যেও একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, যে কসবার যুদ্ধে খালেদ জখম হয়েছে, সেই কসবা মুক্তিবাহিনী ঠিকই দখল করে নিতে পেরেছে।

কসবার যুদ্ধ? অক্টোবরের ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ চারদিনই কাগজে কসবার যুদ্ধ নিয়ে খবর ছাপা হয়েছে পরপর। খুব ফলাও করেই হয়েছে কীভাবে 'ভারতীয় চররা' কামান, ফিল্ডগান, ভারী মর্টার, অ্যান্টিট্যাঙ্ক গান নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে, কীভাবে পাক আর্মি বহু 'ভারতীয় চর' মেরেছে; কিন্তু কোথাও বুঝতে দেয়নি যে মুক্তিবাহিনী তাদের কাছ থেকে কসবা কেড়ে নিয়েছে।

খালেদ মোশাররফ জখম হওয়ার পর এখন হায়দার সেক্টর টু'র চার্জে আছে।

ইতোমধ্যে বাচ্চুর বাড়িতেও বিপদের ঝড় বয়ে গিয়েছে। ওর বাবা-মা-ভাইবোনরা ঢাকায় যে বাড়িতে থাকে, সেখানে হঠাৎ অক্টোবরের ২৩ তারিখে পাক আর্মি গিয়ে ওর পাঁচ ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। ওর বাবাকে বলে তোমার যে ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, তাকে এনে দিলে তবে এই পাঁচ ছেলেকে ছেড়ে দেব। বাচ্চুর বাবা বলেন, সে ছেলের কোনও খোঁজই আমি জানি না— তাকে কী করে এনে দেব? সামরিক কর্তৃপক্ষের কথামতো বাচ্চুকে উদ্দেশ্য করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। যাই হোক, সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন বোঝে যে সত্যিই বাচ্চুর খোঁজ তার বাবা জানে না, তখন তারা পাঁচ ভাইকে ছেড়ে দেয় ৩০ তারিখে।

বাচ্চু বলল, 'এত বিপদের মধ্যে আমরা কিন্তু মনের বল হারাইনি। এরমধ্যেও আমরা অ্যাকশান করে গিয়েছি। সেপ্টেম্বরের শেষে আমরা যখন আসি তখন খালেদ মোশাররফ আর হায়দার ভাই বলেছিল শিগগিরই প্রবলেম বাঁধতে পারে, তোমরা পারলে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে পাঠাও। গত সপ্তাহে আবারও একটা চিঠি পেলাম হায়দার ভাইয়ের কাছ থেকে। শিগগিরই যেন কিছু টাকা পাঠাই। সেজন্য আমরা কয়দিন পলওয়েল মার্কেটে একটা ব্যাঙ্ক লুট করে সেই টাকা সেক্টরে পাঠিয়েছি।'

'পলওয়েল মার্কেটের ব্যাঙ্ক তাহলে তোমরাই—'

বাচ্চু হাসল, 'হ্যাঁ আমরাই।'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না এখান থেকে সেক্টরে টাকাপয়সা পাঠাতে হবে কেন?'

'ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেক্টর টু-তে আর্মস দেওয়া বন্ধ করেছে, টাকা আর রেশনও দিচ্ছে না। তাই। আপনি জানেন না— সেক্টর টু'র সঙ্গে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা প্রবলেম প্রথম থেকেই ছিল। সেটা গত দু'মাস থেকে বেশি হয়ে উঠেছে। ওরা তো সেক্টর টু'কে রেড সেক্টর বলে। ওদের ধারণা— এখানে নাকি নকশালদের হেলপ করা হয়। তাছাড়া আমারও একটা ঘটনা আছে। আমি ভাসানী ন্যাপ রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, তাই আমাকে দু'তিনবার ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্টারোগেশানের জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল, খালেদ মোশাররফ দেয়নি। আমাদের দলের লিডার মানিক, সে ছাত্রলিগ করে, সেও আমাকে কয়েকবার বাঁচিয়েছে। দু'জন দুই রাজনীতির সমর্থক কিন্তু দেখুন যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করছি। মানিক লিডার, আমি ডেপুটি লিডার। এখানে আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই; কারণ এটা আমাদের জাতীয় যুদ্ধ, আমাদের বাঁচামরার ব্যাপার। ওপর দিকে যারা বসে আছে, তারাই খালি ক্ষমতা কী করে দখলে রাখা যায় তার পাঁয়তারা কষছে।'

'তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করলে কীভাবে বলো না।'

বাচ্চু হেসে ফেলল, 'সে এক মজার ব্যাপার, সাত-আটদিন আগে হায়দার ভাইয়ের পাঠানো একটা চিঠি পেলাম— ওখানে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকার দরকার। তখন ঠিক করলাম সাভারে আমাদের বেস ক্যাম্প যেখানে সেখানকার পিস কমিটির মেম্বারদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করব আর ঢাকার একটা ব্যাঙ্ক লুট করব। জোনাকি সিনেমা হলের পাশের ওই মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কটা টার্গেট করলাম। অ্যাকশানে গেল আসাদ, মুনীর, ফিরোজ, জন, আরিফ আর ফেরদৌস। আসাদ নিল একটা স্টেনগান, মুনীরের হাতে তার খেলনা রিভলভার। দেখতে একদম আসল রিভলভারের মতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই খেলনা রিভলভার দিয়েই ওরা

পঁচিশ হাজার টাকা তুলে এনেছিল। আরিফ তার বাবার গাড়িটা একটা বাহানা করে নিয়ে এসেছিল। আমরা নওরতন কলোনিতে জলিদের বাসায় বসে গাড়িটার নম্বর-প্লেট বদলালাম। আরিফের বাবা পির সাহেব তো, তাই তার গাড়িটাও সবাই চেনে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'পির সাহেব!'

'পির সাহেব, কিন্তু ওঁর গাড়িতে আর্মস অ্যামুনিশান লুকোনো থাকে। পির সাহেব বলেই তো সুবিধে। গাড়ির নম্বর-প্লেট বদলে ওরা তো গেল সকাল এগারোটায়। আরিফ গাড়ি চালাচ্ছিল, জন আগেই গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। ওরা ব্যাঙ্কের সামনে যেতেই জন 'অলক্লিয়ার' ইশারা দিল। আসাদ, মুনীর আর ফিরোজ নামল। ঢুকেই প্রথমে দারোয়ানকে কাবু করল, তার রাইফেল কেড়ে নিল। ওদিকে বাইরে কিন্তু আর্মির দুটো লরি দাঁড়িয়ে আছে, তারা বুঝতে পারেনি ভেতরে কী হচ্ছে। আসাদ

কোমরে চিশতীর পিস্তল আর কাঁধের ওপর দিয়ে গুলির বেল্ট ঝুলিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ লাগিয়ে কোমরে দুই হাত রেখে রুমী কী যেন বলছে— এমনি অবস্থায় তোলা ছবিটা। খুবই জীবন্ত মনে হয়।

সঙ্গে শফি ইমাম রুমীর সেই ছবি

ভেতরে স্টেন তুলে সবাইকে বলল, 'হ্যান্ডস আপ।' মুনীর তার খেলনা পিস্তল উঁচিয়ে সবাইকে ক্যাশ কাউন্টারের পিছনে নিয়ে দাঁড় করাল। ম্যানেজারকে যখন বলা হল, 'টাকা দেন।' উনিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই যে টাকা নিয়ে যান। আপনারা মুক্তিবাহিনী, জানি টাকা আপনাদের দরকার।' সবাই খুব কো-অপারেট করল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, টাকা নেব কিসে, ওরা তো টাকার বাণ্ডিল এগিয়ে দিলেন, টাকা নেওয়ার মতো কোনও ভাণ্ড আমাদের নেই, তখন ফিরোজ তার সার্ট খুলে দিল। তার মধ্যে সব টাকা রেখে মুড়িয়ে ওরা যখন বেরচ্ছে, তখন দেখা গেল সার্টের হাতার ফাঁক দিয়ে টাকা পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়।'

হাসতে হাসতে বিষম খেল বাচ্চু, 'সে এক মজার ব্যাঙ্ক লুট বটে! পাকিস্তান আর্মি ততক্ষণে টের পেয়ে গিয়েছে।'

'টের পেয়ে গিয়েছে? টাকা পড়ে যাচ্ছে দেখে?'

'না। রাস্তার লোকের তালি দেওয়া দেখে। এখন ঢাকার লোকের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, মুক্তিরা কোনও অ্যাকশান করলে তারা তালি দেয়, জয় বাংলা বলে ওঠে। এখন তারা আর আর্মিকে ভয় পায় না। ওই তালি শুনেই আর্মি টের পেয়ে যায়। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। আরিফ প্রথম থেকেই গাড়িতে বসেছিল ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে। আসাদ, মুনীররা বেরিয়েই গাড়িতে উঠে ভোঁ দৌড়। আর্মির ওই ভারী লরি ঘুরিয়ে ধাওয়া করতে করতে ওরা হাওয়া। ওরা আবার জলিদের বাসাতেই ফিরে আসে। এই বাসার মেইন গেটটা বেইলি রোডে। ওরা বেইলি রোড দিয়ে বাসায় ঢুকেই ফলস নম্বর-প্লেটটা খুলে ফেলে পিছনের আরেকটা গেট দিয়ে শান্তিনগরের রাস্তায় পড়ে অনেক ঘুরে ধানমন্ডিতে আরিফদের বাসায় চলে যায়। বিকেলে যখন রাস্তায় বেরই তখন দেখি প্রত্যেকটি রাস্তায় কালো মরিস মাইনর চেক করা হচ্ছে। পির সাহেবের গাড়িটা কালো মরিস মাইনর কি না।'

'তোমরা কত টাকা পাঠিয়েছ মেলাঘরে?'

'ব্যাঙ্কের ২৫ হাজার আর পিস কমিটির ২৫ হাজার— মোট ৫০ হাজার টাকা।'

'তোমরা যে এত টাকা পাঠিয়ে দিলে, তোমাদের চলে কী করে?'

'আমাদের? আমাদের চিন্তা কী? আমরা যেখানে থাকি, সব্বাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দিয়ে যায়। যে যা পারে। জেলেরা মাছ দেয়, চাষিরা খেতের তরিতরকারি, একটু ধনী চাষি আস্ত গরু পাঠিয়ে দেয়। নদীর ঘাটে জেলেরা একটা বড় ডুলা বেঁধে দিয়েছে— সকালে নদী দিয়ে যাওয়ার সময় নিজ নিজ নৌকো থেকে যার যা সাধ্যমতো মাছ ওই ডুলাতে দিয়ে যায়। দিনের শেষে দেখা যায় বিশ-ত্রিশ সের, কোনওদিন এক মণ পর্যন্তও মাছ জমেছে। ওই মাছ দিয়ে আমাদের দু'বেলার খাওয়া চলে যায়। এছাড়াও সবাই নিয়মিত চাঁদা দেয়— তা থেকে দলের প্রত্যেককে একশো টাকা করে মাসোহারা দিই। আমরা প্রথম যখন রোহা গ্রামে বেস ক্যাম্প করি, তখন মেলাঘর থেকে এসেছিলাম মাত্র ৫২ জন। আসার পর বহু লোকাল ছেলেপিলে এসে দলে ভর্তি হয়ে গেল। জানেন, মাত্র দশদিনের মধ্যে আমরা ৪৫০ জন হয়ে গেলাম।'

ক্রমশ

অনলাইনে কিনতে ▸www.swarnakshar.in

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

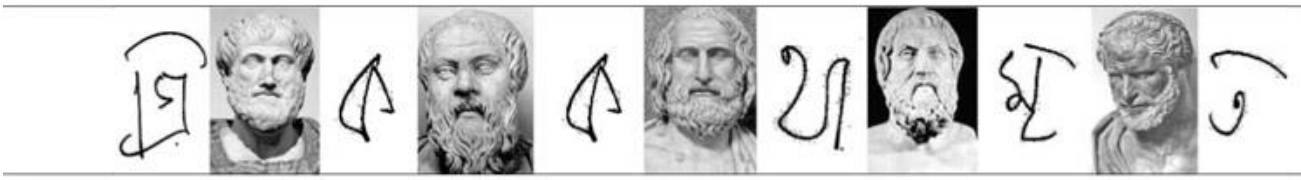

সংকলক ও অনুবাদক
কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ১

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

উ চ্চা কা ঙ্ক্ষা

মানুষ জেনেশুনে যে অন্যায় কাজগুলি করে, তার পিছনে প্রায়ই থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং টাকা আয় করার বাসনা।
অ্যারিস্টটল, পলিটিক্স

দূরের কিছু পাওয়ার জন্য হাতের কাছে যা আছে, তাকে অবহেলা কোরো না।
ইউরিপিডিস/রেস্যুস

ক্রো ধ

সেই লোককে প্রশংসা করা উচিত যে ঠিক কারণে, ঠিক লোকের বিরুদ্ধে আর ঠিকভাবে ঠিক মুহূর্তে ঠিক সময়সীমার জন্য ক্রুদ্ধ থাকে।
অ্যারিস্টটল

সংকটের সময়ে যে ক্রুদ্ধ হয়, সে অসুখের থেকেও বেশি ক্ষতিকর ওষুধ প্রয়োগ করে; সে এমনই একজন চিকিৎসক যে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জুঝতে শেখেনি।
সোফোক্লিস

গো য়া র্তু মি

জিউস সবথেকে বেশি অপছন্দ করেন আত্মপ্রশংসা।
অ্যারিস্টটল

গোয়ার্তুমি জ্ঞানার্জনের বিরাট বাধা।
সোফোক্লিস

লোকে ভাবে কথা বলার ক্ষমতা শুধু তাদেরই আছে বা কথা শুধু তারাই বলতে পারে বা অন্যদের থেকে তারাই সবকিছু বেশি বোঝে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাদের ভিতরটা ফাঁপা।
সোফোক্লিস

বিদ্রুপ জিনিসটা লোককে অপমান করার সুশিক্ষিত অস্ত্র।
অ্যারিস্টটল

ভালো করে খোঁজো আর ভাবো, কখনও মনে কোরো না আত্মবিশ্বাসের গৌরব সুগভীর ভাবনার থেকে ভালো হতে পারে।
অ্যাসকাইলাস

চ রি ত্র নি র্মা ণ

চরিত্রই ভবিতব্য।
হেরাক্লিটাস

ঠিক ঠিক ব্যায়াম করে শরীর গঠন করা যায়। নৈতিক ধ্যানধারণার চর্চা করে মন বা চেতনাকে সংগঠিত করা যায়।
আইসোক্রেটেস

কোনও লোককে তার কথা শুনে

বিশ্বাস করা যায় না, তার কাজ
দেখেই তার কথাগুলি বিশ্বাস করা যায়।
এসকাইলাস

শুধু সেই কাজগুলিই করবে, যার জন্য
তোমাকে দুঃখিত হতে হবে না।
পিথাগোরাস

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দুটো
সঞ্চালক নীতি আছে, যার দ্বারা আমরা
চালিত হয়ে কোনও জায়গায় পৌঁছই;
একটা আনন্দ পাওয়ার অনিবার্য বাসনা,
আর একটা হল বিচারবুদ্ধি যা নিখুঁত
হতে চায়।
সক্রেটিস

খারাপের পথ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়,
তা মসৃণ, তা কাছেই থাকে। কিন্তু
ভালোর সঙ্গে আমাদের যে দূরত্ব, তার
মাঝখানে আমাদের কপাল থেকে ঘাম
ঝরানোর ব্যাপার রেখেছেন ঈশ্বর;
ভালোর কাছে পৌঁছনোর রাস্তাটা লম্বা
আর খাড়া।
হেসিঅড

লজ্জাজনক কোনও কাজ করে ফেললে
তা লুকোনোর কথা ভেবো না, কেন না
অন্যের কাছে লুকোলেও তোমার বিবেক
তা জানবে।
আইসোক্রেটেস

ঠিক বিচারে পৌঁছনো আর মহৎ চরিত্র
বা কাজ থেকে আনন্দ পাওয়ার
থেকে বেশি কিছু শেখার বা চর্চা
করার নেই।
অ্যারিস্টটল

যতই ক্লান্ত থাকো, ঘুমে দুচোখ বুজে
আসার আগে প্রশ্ন করবে: কী করণীয়
ছিল যা করিনি আর কী করেছি? যা
করেছি তা খারাপ কাজ হলে মুছে
দিয়ো, ভালো হলে রেখো।
পিথাগোরাস

মানুষের বয়স নিয়ে ভাববার
কিছু নেই, ভাবতে হবে তার কাজ নিয়ে।
সোফোক্লিস

অ নু ক ম্পা

একটা সহমর্মিতার কাজ, তা যত ছোটই
হোক, কখনও ব্যর্থ হয় না।
ইশপ

সহমর্মিতা দিয়েই সবসময় সহমর্মিতা
অর্জন করা যায়।
সোফোক্লিস

আমরা যদি সবসময়ই পরস্পরকে
সাহায্য করতাম, তাহলে ভাগ্যের কোনও
দরকার হত না।
মিনানডার

একজন ভালো মানুষের কর্তব্য হল
বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
সোফোক্লিস

যে অন্যের কথা ভাবে, সে আসলে
নিজের কথাই ভাবে।
জেনোফোন

রোগগ্রস্ত মনের চিকিৎসার জন্য দরকার
সুন্দর কথা।
এসকাইলাস

সা হ স

গোটা পৃথিবীটাই বীরদের সমাধিমন্দির।
পেরিক্লিস

যে আশাগুলির ওপর আস্থা আছে,
সেইগুলি রক্ষা করাই একজন মানুষের
সাহসের কাজ।
ইউরিপিডিস

একজন সাহসী মানুষের চোখে বিপদ
সূর্যালোকের মতো জ্বলজ্বল করে।
ইউরিপিডিস

বিপদ মাথায় নিয়েও আইনসঙ্গত মহৎ
কাজ করা সাহসিকতা, উল্টোটা ভীরুতা।
অ্যারিস্টটল

তারাই সব থেকে সাহসী, যারা সামনে
কী আছে স্পষ্ট দেখতে পায়— গৌরব বা
বিপদ এবং বিপদ থাকলেও তার
মুখোমুখি হয়।
থুসিডাইডিস

আগামী সংখ্যায় আরও
মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভ্রমণ কথা

প্রবাসে ভোজ্যের বশে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অজানা দেশে অচেনা মানুষজনের মধ্যে গিয়ে ভাষা ও ভোজ্যের সমস্যা নিয়ে কম-বেশি সকলেরই কিছুটা মজার কিংবা সাজার অভিজ্ঞতা হয়। তৃতীয় সমস্যাটা, ঠান্ডা-গরমের সঙ্গে বেমানান ভুল পোশাক-আশাক, তুলনায় লঘু। প্রথম ও তৃতীয় বিপত্তি কোনওভাবে পার হলেও ভোজ্যের সমস্যায় আমাকে হিমশিম খেতে হয়েছে বহুবার।

মোঙ্গোলিয়ার স্তেপ-অঞ্চলই হোক আর সিরিয়ার মরু-অঞ্চলই হোক; আমাজনের আদিবাসী গ্রামই হোক আর মেক্সিকোর রেড ইন্ডিয়ানই হোক, যেখানেই গেছি, প্রতিবারই মনে হয়েছে— স্থানীয় ভাষা আর ঐতিহ্যবহ ভোজ্য একটুও না চাখতে পারলে দেশটাকে চোখের দেখাও যেন সম্পূর্ণ হয় না। কিছু কিছু শব্দ ও বাক্যের অর্থ ও উচ্চারণ স্থানীয় মানুষদের কাছে জিজ্ঞেস করে লিখে নিয়ে অজানা ভাষার কিছুটা স্বাদ অবশ্য পাওয়া যায়, তাছাড়া ইংরিজি জানা কাউকে পেলে তো আর কথাই নেই, তেমন দরকারে অগত্যা ব্যয়বহুল ইন্টারপ্রেটার বা ইংরিজি জানা গাইডও আছে, তারাই স্থানীয়দের মুখের ভাষা বুঝতে সাহায্য করে, ভোজ্যের ব্যাপারে কিন্তু সেটুকু সুযোগও সব জায়গায় মেলে না।

সব সময় ভোজ্যকেই দোষ দেওয়া যাবে না, কখনও কখনও ভাগ্যের দোষেও আমাকে উপোস করতে হয়েছে। তবে সব দেশেই দেখেছি হাতের কাজ ঠিকঠিক সম্পন্ন করতে পারলে ডানহাতের কাজ এক-আধদিন বাদ গেলে খুব একটা মনোকষ্ট হয় না। পরে দেশে ফিরে সেসব নিরন্ন দিন বা বিনিদ্র রাতের কথা ভেবে মজাই লাগে।

মোঙ্গোলিয়ায় ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এরকম একটা ভোজ্যের দুর্যোগের কথা এতদিন পরেও আমার মনে আছে।

একটা ক্যামেরা হাতে নিয়ে, একটা ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে, দুদিন ধরে উলানবাতর চষে ফেলে, পরের দুদিন বিশ্বকবি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের রাষ্ট্রপতির হাতে 'শাদা ঘোড়া' বইটির মোঙ্গোলীয় অনুবাদের মোড়ক-উন্মোচনের কাণ্ডকারখানায় হাজিরা দিয়ে, নিজের কবিতা পড়ে ও মোঙ্গোলীয় কবির কণ্ঠে তার ভাষান্তর শুনে, পঞ্চমদিন সাতসকালে বেরতে হবে, নানা দেশের সম্মিলিত কবিদের নিয়ে যাওয়া হবে মোঙ্গোলসাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কারাকোরামের পথে উলানবাতর থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে বায়ানগোবি-মরুভূমিতে, সেখানে দিগন্তের নেড়া পাহাড়িরেখা অবধি ছড়ানো স্তেপভূমিতে নাদাম উৎসব দেখে তাঁবুতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা।

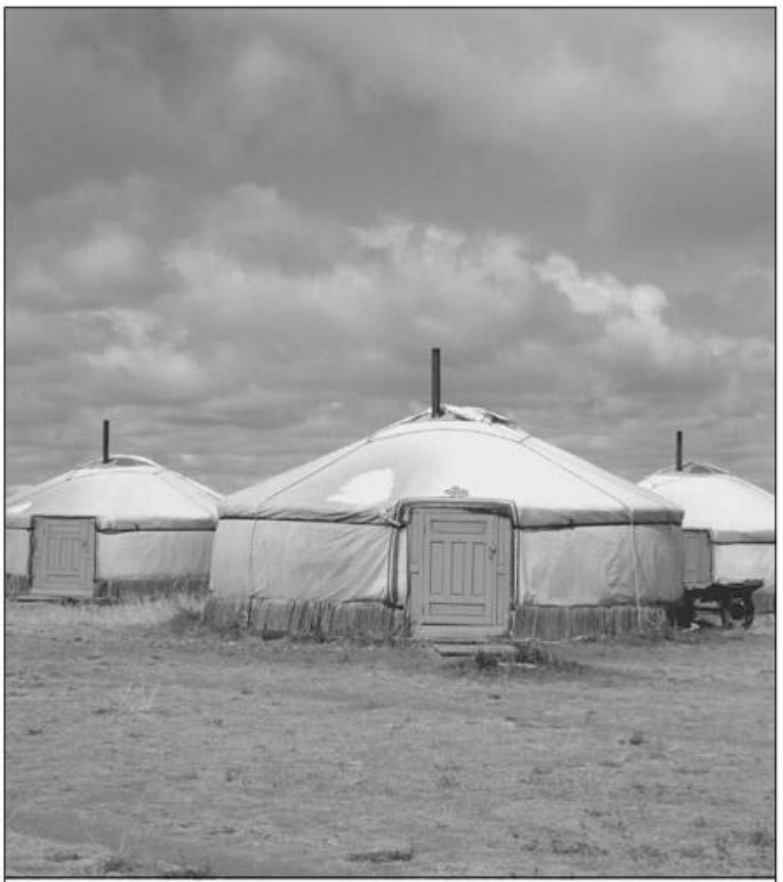

মোঙ্গোলিয়ায় যাযাবরদের গের বা তাঁবুবাসা

সকাল সাতটায় হোটেল থেকে ট্যুরিস্ট কোচ এসে আমাকে তুলে নেবে, সেইমতো ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙানো ফোন চেয়ে কাগজপত্র, ক্যাসেট, ব্যাটারি গুছিয়ে রাত দুটোয় ঘুমের অসীম তৃণাঞ্চলে হারিয়ে গেলাম।

গুম্ফার ঘণ্টাধ্বনিতে জেগে উঠেই

নাদান উৎসবে

চিরাচরিত নাচ-গান, তীরন্দাজি, কুস্তিখেলা, ঘোড়দৌড়ে নাদান উৎসব তখন জমজমাট। ছবি তুলতে বেলা শেষ হয়ে আসছে, ঠান্ডাও খিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে, এমন সময় এক মোঙ্গোলীয় বৃদ্ধ ঘোলের মতো দেখতে কী যেন এক গ্লাস আমার হাতে দিয়ে, মনে হল যেন বাংলায় আমাকে বললেন, 'সারাদিন না খেয়ে মুখ তো তোমার শুকিয়ে গেছে বাছা। শীতের চেয়েও খিদেতেই বেশি কাঁপছ তুমি। একচুমুকে এটা খেয়ে নাও তো।'

ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে কম্বলে কান ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি, বিরক্ত হয়ে জেগে উঠে দেখি ফোন বাজছে। এ-নিশ্চয়ই ভোর পাঁচটার ওয়েক-আপ কল। জেগে গেছি জানাবার জন্য ফোন তুলে গাইডের গলা শুনলাম। সবাই ট্যুরিস্ট কোচে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি যেন নেমে এসে কোচে উঠে পড়ি।

'এখন কটা বাজে?'

'এগজ্যাক্টলি সেভেন ও'ক্লক ইন দা মর্নিং!'

ঘুমঘোরে প্রথম যেটা গুম্ফাধ্বনি ভেবেছিলাম সেটা আসলে ঘুম-ভাঙানো ফোনকল। শান্ত স্বরে বললাম, 'আই অ্যাপলজাইজ ফর দা ডিলে। আইদার লিভ মি ইন উলানবাতর, অর গিভ মি অ্যানাদার টোয়েন্টি মিনিটস টু গেট ইন দ্য কোচ।'

'ইট'স ইমপসিবল!'

'কোনটা অসম্ভব, উলানবাতরে আমাকে ছেড়ে যাওয়া, না নাদাম-উৎসবে যাওয়ার জন্য কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া?'

শেষ পর্যন্ত বিশ্বকবি সম্মেলনের সভাপতি, আমার 'শাদা ঘোড়া'র অনুবাদ-সম্পাদক গোম্বোজাভিন মেনদয়োর হস্তক্ষেপে কুড়ি মিনিট সময় পেয়ে তার আগেই কোচে উঠে জাপানিদের মতো কোমর ভেঙে, থাইদের মতো করজোড়ে বিশ্বের নানা দেশের কবিদের উদ্দেশে বললাম, 'আনকন্ডিশনাল অ্যাপলজি টু ইউ অল।'

মোঙ্গোলিয়ার শহর ছেড়ে দূর অভ্যন্তরে আমাদের যাত্রা শুরু হল। আসলে শুরু হল আমার ভোজের ভোজবাজি।

তাড়াহুড়োয় প্রাতরাশ খাওয়ার চেষ্টা মাত্র না করে বাসের দিকে প্রায় দৌড় লাগালাম। ব্রেকফাস্ট-হলের মোঙ্গোলীয় মাসির দরদ বোধহয় উথলে উঠেছিল। ঠিক দু-মিনিট আমাকে দাঁড় করিয়ে বড় বড় দুটো প্যাকেট একটা শক্ত কাগজের ব্যাগে ভরে নিলেন। আমার কাঁধে-হাতে ক্যামেরা, অন্য হাতে মোঙ্গোলিয়ার দূর প্রান্তরে চারদিন ঘোরাঘুরির পোশাক, ক্যাসেট, ব্যাটারি, দুই ক্যামেরার দুই ব্যাটারি-চার্জার ইত্যাদির ভারি ব্যাগ দেখে আমার সঙ্গে এসে বাসে সবার পিছনের আসনে ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

মোঙ্গোলিয়ার মর্মস্থান দেখব জেনে আশায় আনন্দে উত্তেজনায় মন ভরপুর। সব দেশেই দেখেছি রাজধানীতে, বড় শহরে দেশের নিজস্ব রূপ দেখা যায় না, দেশের মন ছোঁয়া যায় না। উলানবাতরে এ-ক'দিন ঘুরে এবার মোঙ্গোলিয়ার সেই আসল রূপ, আবহমান মন ছুঁতে চলেছি।

পিছনের সারিতে আমার পাশেই এক মোঙ্গোলীয় কিশোর। বা সদ্য-তরুণ। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই। আমারই অনুরোধে উদ্যোক্তারা আমাকে টুকটাক সাহায্য করার জন্য ছেলেটাকে বলে দিয়েছে। আসলে বোধহয় ব্যবস্থাপকদের ফাইফরমাশ খাটতে সঙ্গে চলেছে। আমাকে মাঝে-মাঝেই ড্রাইভারকে বলে-টলে জোর করে বাস থামিয়ে যখন-তখন ক্যামেরা নিয়ে লাফিয়ে পড়তে হয়। হঠাৎ কোথাও দূর থেকে ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে বা ঘোড়ার পাল জল খাচ্ছে, জলে তাদের ছায়া পড়ছে, কিংবা মোঙ্গোলীয় মায়ের কোলে শিশু— এরকম কোনও দৃশ্য পেলেই ক্যামেরা নিয়ে নেমে পড়ি। সেইজন্যই আমার ব্যাগ ও খাবারের ব্যাগ ওই কিশোরের জিম্মাদারিতে রেখে দিয়েছি।

পথে মোঙ্গোলিয়ায় বছরের প্রথম তুষারপাতের ছবি তুলে কোচে ফিরে দেখি ব্যাগ-দুটো সিটে নেই। কী ব্যাপার? আমি তার ভাষা জানি না, ছেলেটি তার মাতৃভাষা ছাড়া শুধু চিনে ভাষা জানে। ফলে তার ব্যাখ্যা ভালো বুঝতে না পারলেও তার আকারে-ইঙ্গিতে যা বোঝা গেল তা এই, ক্যামেরা নিয়ে যাতে আরামে বসতে পারি সেজন্য সে দুটো ব্যাগই সিটের তলায় তার বাঁদিকে রেখে দিয়েছে। সঙ্গে খাবার আছে ভেবেই খিদেকে অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছি। চোখ-মন জানলার বাইরের দৃশ্যে ভেসে যাচ্ছে, হয়তো সেটাও একটা কারণ।

যাই হোক একটু পরে মুখে গ্রাস তোলার ভঙ্গি করে খাবারের ব্যাগটা চাইলাম।

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, সব ঠিক আছে।

ঠিক আছে কী রে! বার করে দাও। আকারে-ইঙ্গিতে এবার আমি ব্রেকফাস্ট করব কথাটা যতই বোঝাই সে ততই আমাকে আশ্বস্ত করে বলে, সব ঠিক

আছে।

মুখ হাঁ করে খাওয়ার মূকাভিনয় করে শেষ চেষ্টা করি।

এবারও সে হাসিমুখে ঘাড় কাত করে জানায় আমার আদেশ-নির্দেশ সে পুরোপুরি মেনেছে। কোনও চিন্তা নেই। বলে আদেশ মানার প্রমাণ হিসেবে সিটের তলা থেকে খাবারের ব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে পরপর দুটো খালি বাক্স খুলে আমার সামনে মেলে ধরে। এক কণা খাবারও সে নষ্ট করেনি, চেটেপুটে সব খেয়েছে।

ছেলেটার আর দোষ কী! সে জানে এই কোচের সব অতিথি হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট করে এসেছে। ছেলেটার ভাগ্যে সেই ব্রেকফাস্ট জুটবে না বলে এই ভারতীয় অতিথি তার জন্য খাবারের প্যাকেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমার উদারতায় এমন ভরপেট সুখাদ্য খেয়ে তার সারা মুখে হাসি, সে হাসিতে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, সংকোচের অপরূপ মিলন দেখে আমি তার পিঠ চাপড়ে আমার খুশি জানাবার চেষ্টা করি।

সৌভাগ্য যখন আসে তখন ছপ্পর ফুঁড়ে আসে কিনা জানবার সুযোগ হয়নি। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন সেটা শুধু সকালের জলখাবারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দুপুরের ভোজনেও ছাই ফেলতে পারে— মোঙ্গোলিয়ায় সেদিন আমার রাতের পরমান্নেও নুন পড়েছিল।

আগে দুপুরের দুর্ভাগ্যের কথা বলি। সীমাহীন এক মহাপ্রান্তরে বাস থামল, সেখানেই আজ মধ্যাহ্নভোজন সারা হবে। বাসের শেষ সারি থেকে সবার শেষে নেমে এসে দেখি দূরে লম্বা একটা কাঠের তক্তাকে টেবিল বানিয়ে তার ওপর লাঞ্চের বাক্সের পাহাড়। টেবিলের সামনে লম্বা লাইন।

এই সুযোগে জায়গাটার ছবি না নিলেই নয়। পেটের খিদে পেটে চেপে মনের খিদে মেটাতে ক্যামেরা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা চলে এসেছি, পিছনে বাসের ঘনঘন হর্ন শুনে সম্বিত ফিরল। দৌড়ে ফিরে এসে দেখি সকলেই বাসে উঠে বসেছে, বাস ছাড়বার জন্য তৈরি। বাসে ওঠবার আগে লাঞ্চের প্যাকেট নিতে গিয়ে দেখি টেবিল ঝাড়পোঁছ হচ্ছে, কোথাও কোনও প্যাকেটই নেই। জিজ্ঞেস করে জানলাম কেউ একজন নিশ্চয়ই দুবার এসে প্যাকেট নিয়ে গেছে। একজন আমেরিকান কবি (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, নাম মনে পড়ছে না, তাঁর দেওয়া কার্ডও হারিয়ে গেছে) বাসের জানলা দিয়ে বোধহয় আমার দুর্দশা দেখেছিলেন, তাঁর সিটের পাশ দিয়ে পিছনের সারির দিকে এগিয়ে যাবার সময় তিনি আমার হাতে বড় একটা চকোলেট আর ছোট্ট একবোতল জল দিয়ে বললেন, 'প্লিজ হেল্প ইওরসেল্ফ।' মোঙ্গোলিয়ার মরুসদৃশ ধুধু স্তেপভূমিতে এভাবেই যেন একটু মরূদ্যানের আরাম পেলাম। যখন যেদেশেই গেছি, দেখেছি আমাদের এই বসুন্ধরা মূলত বন্ধুভরা।

তাই বলে আমার ভোজ্যের দুর্যোগে সেখানেই যবনিকা পড়ল, তা কিন্তু নয়।

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম খোলা প্রান্তরে মোঙ্গোলিয়ার বিখ্যাত নাদাম উৎসবের মধ্যিখানে। চিরাচরিত নাচ-গান, তীরন্দাজি, কুস্তিখেলা, ঘোড়দৌড়ে নাদাম উৎসব তখন জমজমাট। ছবি তুলতে বেলা শেষ হয়ে আসছে, ঠান্ডাও খিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে, এমন সময় এক মোঙ্গোলীয় বৃদ্ধ ঘোলের মতো দেখতে কী যেন এক গ্লাস আমার হাতে দিয়ে, মনে হল যেন বাংলায় আমাকে বললেন, 'সারাদিন না খেয়ে মুখ তো তোমার শুকিয়ে গেছে বাছা। শীতের চেয়েও খিদেতেই বেশি কাঁপছ তুমি। একচুমুকে এটা খেয়ে নাও তো।'

এক গ্লাস শেষ করতেই আরেকজন মাঝবয়সি মহিলা আরও এক গ্লাস একই জিনিস আমাকে এনে দিলেন। দু-গ্লাস শেষ করে মনে হয় দেহে প্রাণ ফিরে এল। পরে শুনেছি ওটা ঘোড়ার দুধ, কিছুটা ফারমেন্ট করে মোঙ্গোলীয়রা নিয়মিত পান করেন। সামান্য টক স্বাদ। নাম আইরাগ, এতে নাকি বারোরকম ভিটামিন আছে, তাছাড়া ঘোড়ার অঞ্চল অনুসারে শতকরা ছয় থেকে বারো ভাগ অ্যালকোহলও আছে। ভয়ানক ঠান্ডায় খিদে-তেষ্টার কষ্ট কাটিয়ে আইরাগ পান করে কিছুটা চাঙ্গা তো হলাম।

এরপরও যবনিকা পতন বাকি।

নাদাম উৎসবের পর ওই সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে আরও দেড়-দুঘণ্টা বাসযাত্রার শেষে পর্যটকদের জন্য

কারাকোরামের গুম্ফায়

বাইরে আসতেই আবার সেই শীতের ঝাপট। ঘুরতে ঘুরতে আরও উঁচু, রেলিং ঘেরা একটা জায়গায় পৌঁছলাম। নীচে চেয়ে দেখি দুদিক থেকে দুটি নদী এসে আরেকটা নদীর সঙ্গে মিলেছে। দুই নদীর নাম থেৎরি (সাদা) আরাগ্রি আর শাবি (কালো) আরাগ্রি, এরা এখানে এসে মিলেছে দকুবারি (তুর্কি ভাষায় 'কুরা') আরাগ্রিতে। আরাগ্রি মানে নদী। কুরা নদী তুর্কি থেকে এসে জর্জিয়া হয়ে আজারবাইজানে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে।

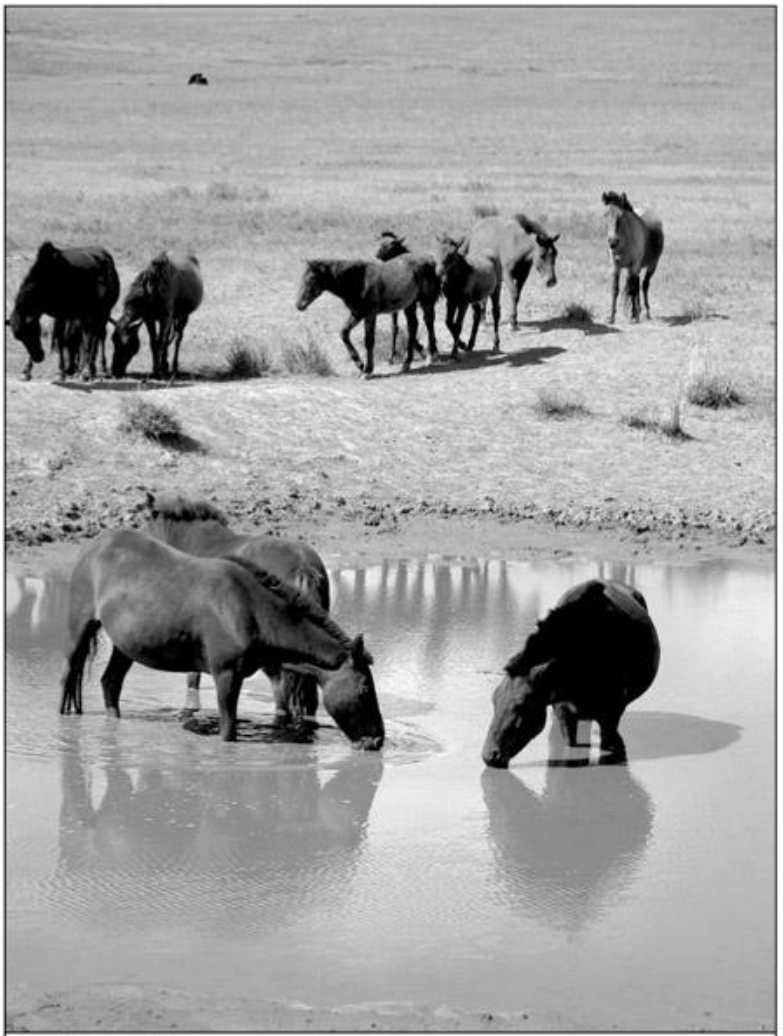

মোঙ্গোলিয়ার তৃণভূমিতে

বানানো মোঙ্গোলীয়দের গের অর্থাৎ তাদের বিশেষ ধরনের তাঁবুর বাসায় এসে উঠলাম। সন্ধে নামলেও তখনও অদূরে ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর মোঙ্গোলীয়দের মুখমণ্ডলের মতো বিরাট পূর্ণিমার চাঁদ। তাঁবুর সামনে থেকেই যেটুকু সম্ভব ছবি নিলাম। শীতে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কঠিন। অনেকটা মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁবুর দরজা সরিয়ে ভেতরে শূন্য তাঁবুতে কাঠের তক্তায় পুরু ও শক্ত তোশকের ওপর লম্বা হয়ে আপাদমস্তক দুজোড়া মোটা কম্বল চাপালাম। পায়ের মোজা মাথার টুপি যেমন ছিল, তেমনই পরা রইল, তাতেও শীত যায় না।

খানিক পর মোঙ্গোলীয় এক যুবক এসে আমাকে আকারে-ইঙ্গিতে নৈশভোজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। চার-পাঁচটা মাঝারি মাপের ঘরে বিদেশি অতিথিদের জন্য স্কুলের মতো বেঞ্চ ও হাই বেঞ্চ পেতে খাবার ঘর করা হয়েছে। একেকটি বেঞ্চে পাঁচজনের বসার ব্যবস্থা, একেকটা ঘরে কুড়িজন খেতে পারবে।

সকলেই নিজেদের মধ্যে নিজেদের দেশ নিয়ে কথা বলছে। আমাকেও ভারতের নানা কথা জিজ্ঞেস করল। কবিতার কথা অল্পই উঠল। তাছাড়া ভাষার সমস্যায় খুব বেশি কথা হওয়াও মুশকিল। হলেও তা বোঝা ও তাতে অংশ নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

যাই হোক, আমাকে বেশ খাতির করে প্রথম বেঞ্চের শুরুতেই বসানো হয়েছে। প্রথমে মোঙ্গোলিয়ার কী একটা কড়া পানীয় ছোট ছোট গ্লাসে বেশিরভাগ অতিথিই পান করলেন। আমার সাহস হল না, তাছাড়া খালি পেটে যা হোক কিছু একটা খাবার ঢোকাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। বহু কসরত করে, শেষ পর্যন্ত পোয়েটস কংগ্রেসের সভাপতির সাহায্যে আমি শুধু এইটুকু বোঝাতে পেরেছি যে আমি গরু ঘোড়া উট বা ওইরকম কিছুর মাংস খাই না, নিরামিষ না মিললে চিকেন চলতে পারে।

পরপর দুজন পরিবেশক খাবার নিয়ে ঢুকল। একজন সকলের প্লেটে বড় ঘুঁটের মতো কী একটা মাংসখণ্ড দিচ্ছে, হয়তো তপ্ত পাথরের চাপে বানানো মোঙ্গোলীয়দের জাতীয় খাদ্য খোরখোগ, তার পিছনের জন ইঞ্চিখানেক পুরু রুটি দিচ্ছে দুটো করে। বেশ কিছুক্ষণ পর আরেকজন সম্ভবত গরু বা ঘোড়ার মাংসের বড় একটা করে ফালি দিয়ে গেল। আমার পাশের অতিথির প্লেটে আড়চোখে চেয়ে মনে হল, এটা মোঙ্গোলীয় বুদগ, মাংসখণ্ডটি সেই প্রাণীর চামড়া দিয়ে মোড়া। দুবারই আমাকে শূন্য প্লেটের ওপর হাত চাপা দিয়ে বোঝাতে হয় আমার জন্য চিকেন বলা আছে।

প্রথম ব্যাচ খাওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যাচ এসে আসন গ্রহণ করলেন। এঁরা অধিকাংশই লাতিন আমেরিকার দেশের কবি। একই খাদ্যবস্তু, একভাবেই পরিবেশন করা হল। আমাকেও একইভাবে প্লেটে হাত চাপা দিয়ে চিকেনের কথা জানাতে হল।

তৃতীয় ব্যাচে অধিকাংশই মোঙ্গোলীয় কবি। অনেকেই আমার সঙ্গে ছবি তুলেছে, বই বিনিময় করেছে। যে আমার কবিতার মোঙ্গোলীয় ভাষান্তর কবিসম্মেলনে পড়ে শুনিয়েছে সে আরও কয়েকজনের সঙ্গে উঠে এসে আমার সমস্যার কথা জেনে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বোধহয় রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকা একজন এসে জানাল— চিকেন তৈরি হচ্ছে, এই এল বলে।

তৃতীয় ব্যাচের খাওয়া শেষ হবার আগে একজন, সে মোঙ্গোলিয়ার ঐতিহাসিক নায়ক সুখাবাতারের ছেলে বলে মোঙ্গোলীয় ভাষায় লেখা নিজের বই ও পরিচয় দিল, টেবিল ছেড়ে আবার ভেতরে গিয়ে কাকে কী বলল। এবারও

একজন ভেতর থেকে এসে জানাল— আপনার জন্য স্পেশ্যাল চিকেন তৈরি হচ্ছে, এই এল বলে!

'হলে আমার গের-এ পাঠিয়ে দেবেন। আমার গের নম্বর দশ।'

তাঁবুতে ফিরে মোজা, টুপি সুদ্দুই চার প্রস্থ কম্বলে শুধু গা নয়, মাথাও ঢাকা দিলাম।

এবার তাঁবুর দরজায় শব্দ শুনে দেখি এক মোঙ্গোলীয় তরুণ-তরুণী তাদের ভূত তাড়ানোর অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। প্রেসিডেন্ট বলে পাঠিয়েছেন আমাকে যেতেই হবে।

তাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি বড় বড় আগুন জ্বালিয়ে নানারকম কাঠি, হাড়, মালা উঁচিয়ে মন্ত্র পড়ে তাদের ভূত তাড়ানোর আচার-অনুষ্ঠান চলছে। মন্ত্রের গুণে না হোক অন্তত আগুনের গুণে শরীরের তাপ ফিরে এল।

আবার তাঁবুতে ফিরে একইভাবে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে শীতে কাঁপছি, হঠাৎ দেখি এবার একটি ছোট মেয়ে এসে তাঁবুর মাঝখানের আগুন করার জায়গায় ভালোমতো কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। তাঁবুর মধ্যে শুধু আগুনের তাপ, আর তার ধোঁয়া চোঙা দিয়ে তাঁবুর মাথার ওপর দিয়ে আকাশে চলে যাচ্ছে।

আরামে ঘুমিয়ে পড়েছি, দরজার শব্দে জেগে দেখি হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো পায়ে একজন একটা প্লেটের ওপর আরেকটা প্লেট চাপিয়ে আমার ডিনার দিয়ে গেল।

সামনে খাবার দেখেও কম্বলের নীচ থেকে বেরনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত উঠে বসে ঢাকনা তুলে দেখলাম আস্ত একটা মুরগির অর্ধেকটা, বোধহয় তন্দুরে তৈরি। রুটি বা অন্য কিছু নেই। তবে আমার পক্ষে অত বড় মুরগির কিছুটা খেতে পারলেই ঢের। কম্পিত হাতে এক টুকরো ছিঁড়ে মুখে দিয়েই ফেলে দিতে হল, একটুও নুন দেওয়া হয়নি। সেটা কি এদের খাদ্যাভ্যাস, না কি নিছক মনের ভুল, জানবার সুযোগ পাইনি।

মোঙ্গোলিয়ার রাজধানীতে ভোরের ভোজ্যের দুর্যোগপর্বে সেদিনের মতো যবনিকা পড়ল বহু দূরের এক অসীম স্তেপভূমিতে, মধ্যরাতে।

মার্কিন মহিলার চকোলেট আর তাঁবুবাসী যাযাবর মোঙ্গোলীয়দের ঘোড়ার দুধে সেবার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল, সেই আনন্দটুকুই আমার মনে ধরা আছে।

দুধের কথায় মনে পড়ল, আমাজনে কিছুটা জল-মেশানো দুধের মতো দেখতে একরকম ফলের রস তারা নিজেরা পান করে, অতিথিদের পান করতে দেয়। মোঙ্গোলীয় ঘোড়ার দুধ বা ঘোলের মতোই আমাজনের সেই ফলের রসেও কিছুটা টক ভাব আছে। সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম জঙ্গল-হোটেল আমাজন আরিয়াউ টাওয়ার হোটেলে বিশ্বসম্পাদক সম্মেলনোত্তর ভ্রমণে দিনচারেক ছিলাম। একদিন মধ্যাহ্নভোজে একটা রেকাবিতে চার-পাঁচ ফুট লম্বা একটা আস্ত মাছ দেখে আমি সন্তর্পণে এড়িয়ে সবজি ও ফলের সন্ধানে শতব্যঞ্জন সাজানো বিশাল টেবিল পরিক্রমা করছি দেখে 'মালয়ালম মনোরমা' কাগজের তখনকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জ্যাকব ম্যাথু বললেন, মাছ নেননি দেখছি, বেশিক্ষণ থাকবে না, তাড়াতাড়ি তুলে নিন। একেবারে স্বর্গীয় স্বাদ।

তখনও প্রায় আস্তই আছে। কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে রেকাবের পাশের বড় ছুরি দিয়ে পাতলা করে কেটে সেই এক চিলতে মাছ নিয়ে ভিড় থেকে দূরে গিয়ে মুখে দিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যিই স্বর্গীয় স্বাদ। এবার ভালোমতো একটা টুকরো কেটে নেবার জন্য মাছের রেকাবির কাছে এসে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। শুধু মাছের মাঝখানের কাঁটাটি পড়ে আছে! তবে আমাজনে আমার খাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যায় পড়িনি। ওখানকার পেঁপে প্রায় আমাদের হিমসাগর। আর মন ভরাবার আদিম জলজঙ্গল আর তার কীটপতঙ্গ আর বিচিত্র বানরকুল তো আছেই।

এবার জর্জিয়ার ডিনার আর ব্রেকফাস্টের কৌতুককাহিনী। জর্জিয়ার প্রাচীন রাজধানী থেতা (Mtskheta)-য় খুব বড় ধর্মীয় উৎসব— থেতোবা (Mtskhetoba), বাংলায় থেতা উৎসব। 'দিলিস গাজেতি' (ডেইলি গেজেট) আমাকে এই উৎসব দেখাবে এবং আমার সম্মানে থেতাতেই ডিনারের আয়োজন করেছে। নৈশভোজ বসবে ডেইলি গেজেট-এর থেতাবাসী একজন উচ্চপদস্থ কর্মীর বাড়িতে।

ঠিক হল সকাল আটটায় আমরা

> অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ হৃদয়ে জর্জিয়ার এই জাতীয়-শিল্পীর ছবি দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে নানা বয়সের মহিলারা বড় বড় সব কাঠের পাত্রে, সেরামিক ও রুপোর পাত্রে গন্ধে আকুল করা সুখাদ্য আমার পাশের বড় একটা ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে মৃদু আশা, একটু দেরি হয়ে গেলেও এ নিশ্চয় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন! এই ডাক পড়ল বলে!

বেরব, কেননা ন'টার আগে পুলিশচৌকি পেরিয়ে না গেলে পরে আর উৎসবের জায়গা পর্যন্ত কোনও গাড়ি যেতে দেবে না। তখন অনেকটা রাস্তা আমাদের হাঁটতে হবে। উৎসবে অস্বাভাবিক ভিড় হয়, একটু বেলা হলেই উৎসবমুখী রাস্তায় মানুষের ঢল নামে, তার আগেই সব গাড়ি রুখে দেওয়া হয়।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি চারদিক স্যাঁতসেঁতে, আকাশ-বাতাস কালো হয়ে আছে, তার মধ্যেই ঝিপঝিপে বৃষ্টি।

লেপ না সরিয়ে শুধু একটু মাথা তুলে একটুখানি জানলা ফাঁক করেছি, ঠান্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির ছাটে মুখ-কপাল সব হিম হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা। এই অবস্থায় আমাদের থেতা উৎসবে যাওয়া হবে কি?

বাথরুমের পথে দেখা হল ভাজিকের সঙ্গে, জগিং সেরে এসে জুতোর জলকাদা সাফ করছে। ও জগিং করতে যায় পাহাড়ের নীচে মস্ত বড় ফাঁকা জায়গায়। আমাকেও রোজ ডেকে নিয়ে যায়, আজ যাব না সেকথা কালই জানিয়ে রেখেছি। তাছাড়া ভাজিকের মতে ওই পাহাড়টা ককেশাস, এমনকি লিটল ককেশাসও নয় শুনে মর্নিং ওয়াকে আমার উৎসাহেও কিছু

ভাটা পড়েছে। মানানার দাবি ওটা ককেশাসেরই একটা শাখা, তবে 'রাশিয়ান, থুড়ি, উইক্রেনিয়ান হলেও জর্জিয়ার ভূগোল আমার চেয়ে ভাজিকই ভালো জানে।'

খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল মানানা গভীর ঘুমে। এমন বিশ্রী মেঘবৃষ্টির দিন, বেরবার সময় হয়ে গেছে, গৃহকর্ত্রী তখনও নিদ্রামগ্ন, ভাজিকও কী একটা রুশ প্রবাদ আওড়ে চোখ মটকে তার অর্থ করে দিল— এরকম আবহাওয়ায় দিন শুরু করতে হয় ভদকা দিয়ে, শেষও করতে হয় ভদকা দিয়ে, আর মাঝের সময়টাও ভাসিয়ে দিতে হয় ভদকায়। শুনে আমি একশো ভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে লেপের নীচে ফিরে গেলাম।

বোধহয় দশ মিনিটও হয়নি, কোন বিদেশে কাদের সঙ্গে কেমন একাত্ম হয়ে আছি ভাবতে ভাবতে সবে আরামে আমার দু-চোখ জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার নাম ধরে মানানার চিৎকারে লেপ ফেলে দৌড়ে যাই।

ভুরু কুঁচকে বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, এ কী! তুমি তৈরি হওনি?

ঘড়িতে দেখলাম ঠিক আটটা। মানানা বেরবার জন্য একেবারে তৈরি।

আমার জন্যই আমাদের বেরতে একটু দেরি হয়ে গেল। ভাজিক অবশ্য এল না, তার নাকি 'ভেরি মেনি' ওয়ার্কস আছে। আমি একবার অনুরোধ করতে যাচ্ছিলাম, মানানা চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলল, রোজই ওর 'ভেরি মেনি' ওয়ার্কস থাকে তুমি জানো না? 'থেতোবা'য় সবার ছুটি, সেদিনও ওর কি কাজ না করলে চলে নাকি?

মানানার আশঙ্কাই সত্যি হল। কিছুদূর যাবার পর পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকে দিল। এখানে নামলে অনেকটা হাঁটতে হবে, অতএব গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের রাস্তা ধরে অন্য একটা রাস্তায় পড়ে আমরা প্রথমে গেলাম ছুয়ারি বা জুয়ারি। জর্জিয়ার সবচেয়ে উঁচুতে এই প্রাচীন গির্জা, জায়গাটা বোধহয় ১২,০০০ ফুট উঁচু, আর তেমনই হাওয়ার দাপট, মনে হয় বড় বড় বরফের চাঁই সোজা হাড়ের ওপর কেউ ঘষে দিচ্ছে। তাড়াহুড়োয় ভারি গরমের জামাকাপড়ও বেশি কিছু চড়ানো হয়নি। আমার দাঁতে দাঁতে খটখটি শুনে মানানা অপ্রস্তুতের একশেষ, তার নিজের গায়ে বোধহয় সাইবেরিয়ার গরম পোশাক! ওপরে উঠছি তো উঠছিই, গাড়ি থেকে নেমেও আরও খানিকটা উঠে ষষ্ঠ শতাব্দীর গির্জার সামনে পৌঁছলাম।

মস্ত উঁচু কাঠের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে শীতের কামড় থেকে শুধু রক্ষাই পেলাম না, অদ্ভুত আরামে উষ্ণতায় মোমের আলোয়-গন্ধে দেহ যেন ধন্য হল।

মানানা, ডেইলি গেজেটের ফটোগ্রাফার, গাড়ির ড্রাইভার— সকলেই যখন উপস্থিত অসংখ্য জনের সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছে আমি তখন ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে সিলিংয়ে মেঝেয় রঙিন চিত্র দেখে বেড়াচ্ছি।

বাইরে আসতেই আবার সেই শীতের ঝাপট। ঘুরতে ঘুরতে আরও উঁচু, রেলিং ঘেরা একটা জায়গায় পৌঁছলাম। নীচে চেয়ে দেখি দুদিক থেকে দুটি নদী এসে আরেকটা নদীর সঙ্গে মিলেছে। দুই নদীর নাম থেৎরি (সাদা) আরাগ্রি আর শাবি (কালো) আরাগ্রি, এরা এখানে এসে মিলেছে দ্‌কুবারি (তুর্কি ভাষায় 'কুরা') আরাগ্রিতে। আরাগ্রি মানে নদী। কুরা নদী তুর্কি থেকে এসে জর্জিয়া হয়ে আজারবাইজানে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে। মাসতিনেক আগে আমাজনে দেখেছি নিগ্রো (কালো) আর সোলিময়েস (হলদে) নদী মিশেছে আমাজন নদীতে, জর্জিয়ায় দেখলাম সাদা আর কালো নদী— থেৎরি আর শাবি।

জুয়ারি থেকে নেমে অনেকটা রাস্তা উজিয়ে ফিরে এলাম থেতার পথে। এবারও পুলিশ পথ আটকাল। এবারে পুলিশ আরও বেশি কড়া, কেননা এখান থেকেই রাস্তায় প্রচুর ভিড় দেখা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাব, না এখান থেকেই ফিরে যাব তাই নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে মানানার আলোচনা চলছে, হঠাৎ দীর্ঘনাসা দীর্ঘদেহী মুণ্ডিতমস্তক ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে গিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে কী বললেন, পুলিশ অফিসারটি ঝুঁকে জানলা দিয়ে মানানাকে দেখে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। কী ব্যাপার? নোদার দুমবাদজের মেয়ে মানানা দুমবাদজে সত্যিই এই গাড়িতে যাচ্ছেন কিনা পুলিশ অফিসার শুধু সেটুকু দেখে নিলেন। সাহিত্যের প্রতি সাধারণের এই অনুরাগ, সাহিত্যিকের প্রতি রাস্তাঘাটেও এই সম্মান জর্জিয়ার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দিল।

থেতায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে দেখি ক্যাথিড্রালের পথে মানুষের ঢল নেমেছে। ভিড়ে এগনো অসম্ভব, হাঁটাই দায়! তার ওপর জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট শেভারনাদজে এসেছেন, তাঁকেও দেখলাম ভিড়ে ধীরগতি। মানুষের মিছিল এগোচ্ছে শামুকের মতো, মাঝে মাঝে মনে হয় এই বুঝি ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যাবে। রাস্তার ধারে নানারকম ভিখিরি ও মোমবাতি বিক্রেতা, খাবারের পশরা নিয়ে বসেছে অনেকে। ভিড়ে আটকে পড়া মানুষের রাগ-বিরক্তিও কানে আসছে, মানানার তাৎক্ষণিক তর্জমায় সব কথাই বুঝতে পারছি।

পরদিনের 'দিলিস গাজেতি' কাগজে 'ইন্ডিয়ান উইসডম অ্যান্ড লাভ ফর জর্জিয়া' শিরোনামে আমার এই থেতা উৎসব দেখার খবরে লেখা হল—

জর্জিয়ান খ্রিস্টানদের এই থেতা উৎসবে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। ক্যাথিড্রালের সামনে বিরাট ভিড়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী মন দিয়ে সেই ভিড়ের নানা কথা শুনছিলেন, ভিড়ের মধ্যে লোকেরা তাদের দুঃসহ দারিদ্র আর দুর্বহ জীবনযাপনের জন্য ক্ষোভ জানাচ্ছিল, মানানা দুমবাদজে প্রত্যেকটি শব্দ চক্রবর্তীকে ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ শোনার পর চক্রবর্তী বললেন, মানুষের সুখ-দুঃখ সারা পৃথিবীতেই এক। সুখ-দুঃখের আসল কারণগুলোও এক।

অনুষ্ঠানের পর দিলিস গাজেতির কর্মীবৃন্দ আয়োজিত এক ঐতিহ্যপূর্ণ জর্জিয়ান নৈশভোজে চক্রবর্তীকে আপ্যায়ন করা হয়। ভোজসভার টেবিলে গৃহকর্তার পরিবারের তিন পুরুষকে উপস্থিত দেখে তিনি খুব খুশি হলেন কেননা ভারতেও নাকি এরকমটা দেখা যায়। আধুনিক ভঙ্গুর সমাজে তিনি এটাকে সভ্যতার সবচেয়ে সুন্দর বিলাসিতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখের যে আজ আর আমরা এটা বুঝতে পারি না। সম্পর্কের বিস্তার ও গভীরতাকে তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব বলে মনে করেন।

ডিনার যখন শেষ হল, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে এবং সকলেই তাঁর

কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, তখন এই ভারতীয় লেখক-পর্যটক এক গর্ভবতী মহিলাকে দেখে বলেন, আমার বিশ্বাস এই শিশুটি বড় দার্শনিক হবে এবং জর্জিয়ার সংকটে পথ দেখাবে। তাঁর এই বিশ্বাস ও কল্পনা আমাদের সকলেরই ভালো লাগল। চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটাই যে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ককে অন্তর থেকে মানেন ও মূল্য দেন। তিনি বলেন, সর্বত্র এই সম্পর্ককে সযত্নে লালন-পালন করা দরকার।

খবরের কাগজে ছাপা না হলে, এসব তুচ্ছ কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ত না। অথচ সেদিনের ডিনারের অনেক মজার স্মৃতি ভোলবার নয়।

সবচেয়ে বেশি মনে আছে পাঁচ ঘণ্টার রাজকীয় ভোজনের আগে প্রায় দশ ঘণ্টার উপোসের বেদনা।

সকালে বেরবার আগে তাড়াহুড়োয় ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা যায়নি, রাস্তায় যেতে যেতে হয়তো খানিকটা অপরাধবোধ থেকে মানানা মাঝে মাঝেই শোনাচ্ছে— খেতায় আজ তোমার সম্মানে ডিনার! জর্জিয়ার সর্বোচ্চ জায়গায় শীতে যখন শরীরের হাড়ে হাড়ে বাজছে স্পেনদেশীয় ফ্লামেঙ্কো নাচের দ্রুত তালের কাঠ-খটখটি বাজনা, দুপাটি দন্ত-মাধ্যমে তা শোনাও যাচ্ছে, তখনও মানানা আমার দিকে সকরুণ চেয়ে থেকে জর্জিয়ার ঐতিহ্যপূর্ণ ডিনারের সংবাদ দিয়েছে।

আমি ভেবেছিলাম অনেকে ভুল করে লাঞ্চ-ডিনার গুলিয়ে ফেলে, এও নিশ্চয় তা-ই, তা না হলে সকালে ব্রেকফাস্ট হয়নি, দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা শোনা যাচ্ছে না, সোজা একেবারে ডিনার?

উৎসব শেষে যখন ডিনারস্থলে পৌঁছলাম, তখন দুপুর তিনটে। মুখ তেতো, খিদেয় পেটে যেন হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটিং চলছে, হঠাৎ গেট দিয়ে ঢুকেই মাথার ওপরে থোকা থোকা কালো আঙুর ঝুলছে দেখে ভারি শান্তি বোধ হল। গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী দুজনেই এগিয়ে এসে একে একে মানানার সঙ্গে এক গালে চুম্বনবিনিময় করলেন, কর্ত্রী ঠাকরুন এসে ডান হাতে আমার পিঠ জড়িয়ে ধরে সাদরে ভেতরে নিয়ে চললেন। দোতলায় নিয়ে আমাদের যেখানে বসালেন, সেখানে নিচু টেবিলে প্রচুর বই ও কয়েকটা পেইন্টিংয়ের অ্যালবাম।

বইয়ের মধ্যে যে কোনও জর্জিয়ান পরিবারে রুসতাভেলির 'ব্যাঘ্র চর্মাবৃত নাইট' থাকবেই, আর যদি একজন চিত্রশিল্পীও থাকেন, তিনি ফিরোসমানি।

অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ হৃদয়ে জর্জিয়ার এই জাতীয়-শিল্পীর ছবি দেখছি, চোখের সামনে দিয়ে নানা বয়সের মহিলারা বড় বড় সব কাঠের পাত্রে, সেরামিক ও রুপোর পাত্রে গন্ধে আকুল করা সুখাদ্য আমার পাশের বড় একটা ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে মৃদু আশা, একটু দেরি হয়ে গেলেও এ নিশ্চয় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন! এই ডাক পড়ল বলে!

আরও দু-তিনটে বই নাড়াচাড়া করার পরেও যখন চোখের সামনে দিয়ে শুধু নানা আকারের কারুকার্যময় সুগন্ধ পাত্র-হাতে পাত্রীদের ঘরের মধ্যে চলে যেতে দেখছি তখন আর সন্দেহ রইল না যে খাবারের এখনও ঢের দেরি, এ তো ডিনারই!

বিকেল পাঁচটায় গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এসে আমাদের মস্ত বড় খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বিশাল টেবিলে পাত্র-পাত্রী খাবার পানীয়ের বৈচিত্র্যে প্রাচুর্যে সাজসজ্জায় এতক্ষণের খিদেও অতি তুচ্ছ মনে হল।

এইরকম আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় অতিথির উদ্দেশে পানীয় 'টোস্ট' করা একটা দেখবার মতো ব্যাপার বটে! আমার উদ্দেশে একটু পর পর একেক জনের দীর্ঘ বাগবিস্তারের সঙ্গে মস্ত বড় ওয়াইন গ্লাস হাতে দীর্ঘ 'টোস্ট'-এর ধকলে আমার তো ভিরমি খাবার জোগাড়!

টোস্ট করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ বিড়বিড় ক'রে, কেউ স্পষ্ট গলায় আমার উদ্দেশে নানা সুবাক্য ব'লে, কখনও আমার প্রশস্তি ও কুশল-কামনা ক'রে, কখনও মহান ভারতীয় অতিথিকে নানা বিশেষণে ভূষিত ক'রে বা দুই দেশের মৈত্রী-প্রীতির বিকাশ ও স্থায়িত্ব চেয়ে এক চুমুকে লম্বা গ্লাসের সবটুকু লাল বা সাদা মদ শেষ করে। মানানা তার আগেই প্রায় ঝড়ের গতিতে টোস্টের বাণী বা বক্তব্যের সারাংশ আমার জন্য ইংরিজি করে দেয়। উত্তরে আমাকেও কিছু বলতে হয়, মানানা জর্জিয়ানে তার অনুবাদ করে।

নতুন কোনও কথা মনে উদয় হওয়ায় কেউ কেউ আবার উঠে দাঁড়িয়ে নতুন বাক্যরাজি বলে এক চুমুকে পূর্ণ গেলাস শূন্য করে দেয়। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এরকম বারকতক গ্লাস শেষ করতে দেখে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায়। নিয়ম হচ্ছে, যার উদ্দেশে এতসব শুভেচ্ছাবাণী তাকেও একই সঙ্গে এক চুমুকে সুরাপাত্র খালি করে দিতে হয়। প্রথম প্রথম এঁরা আমার উদ্দেশে কে কী বলছেন, তার ইংরিজি অনুবাদে মন দিতে গিয়ে আমি গেলাসে পাল্টা চুমুক দিতে ভুলে যাই, মানানার খোঁচা খেয়ে খেয়াল হতে আমি বুদ্ধি করে বড় গ্লাস রেখে ভোজনান্তের লিকিয়্যারের ছোট্ট গ্লাস হাতে নিয়ে টোস্টযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

ভোজসভায় নিমন্ত্রিত বা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাপকরা সবাই সংবাদপত্রের কর্মী, ফলে যাঁর যখন কাজ শেষ হচ্ছে তিনি তখনই ভোজসভায় যোগ দিচ্ছেন এবং এসেই তাঁর প্রথম কর্তব্য আজকের 'মহান অতিথি'র সঙ্গে পানীয় টোস্ট করা। সেই

> পেঁয়াজ-টোমাটো-চিজ দিয়ে প্লেটজোড়া স্টাফ্‌ড্ ওমলেট বানিয়ে প্রথমদিনের জর্জিয়ান রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিয়েছে। বলল, সে এই স্পেশ্যাল ওমলেট বানিয়েছে ইউক্রেন থেকে ভাদিকের আনা কালকের ভেরি স্পেশ্যাল নুন দিয়ে। খিদে ভালোই পেয়েছিল, ওমলেট এক টুকরো মুখে দিয়ে মনে হল ইউক্রেনের নুনে নোনা স্বাদটা একেবারেই নেই, মুখে শুধু মিহি বালি টের পাচ্ছি।

বিরাট গ্লাস, সেই বাগবিস্তার, সেই এক চুমুকে পাত্র খালি করা। আমার হাতে সেই ছোট্ট লিকিয়্যরের গ্লাস।

এ তো গেল মধ্যাহ্নে অনাহারের পর মধ্যরাত পর্যন্ত মহাভোজের বৃত্তান্ত। এবার এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রাতরাশে বালিঝড়!

সন্ধেবেলা জর্জিয়ার অসামান্য কবি তারিয়েল চানতুরিয়ার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে মানানাদের বাড়ি ফিরে দেখা হল মানানার স্বামী ভাদিকের সঙ্গে। দরজা খুলেই মানানাকে শশব্যস্ত আলিঙ্গনে চুমু খেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে এক গালে চুমু দিল। জর্জিয়ায় ইউরোপের মতো দুগালের বদলে এক গালে চুমু দেওয়াই রীতি। আমিও ভাদিকের গাঢ় বলিরেখা আঁকা গালে অনভ্যস্ত চুমু দিলাম। ও আজই রাশিয়া থেকে ফিরেছে। ভাদিকের স্বপ্ন বেলুনে চড়ে সিল্ক রুট অভিযান। মস্কোর পর্যটন মেলায় গিয়েছিল বেলুনের কলকৌশল বুঝতে।

সেদিন মানানার বাড়িতে ডিনার বলতে সেই প্রথম সন্ধ্যার ডিনারের ভুক্তাবশিষ্ট, যদিও পরিমাণে কম নয়। অতএব, আমার ভাগেই বলি আর ভাগ্যেই বলি সেদিনের সেই লতাপাতা-শেকড়বাকরের টক-টক স্যালাড কিংবা আচার 'জঞ্জলি' চিবনো।

আমার দুর্দশা গৃহকর্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু এত রাতে, এত পথের ক্লান্তিতে তিনিই বা কী করবেন!

বোধহয় রাতের সেই ক্ষতি পূরণ করতেই পরদিন সকালে মানানা পেঁয়াজ-টোমাটো-চিজ দিয়ে প্লেটজোড়া স্টাফড্ ওমলেট বানিয়ে প্রথমদিনের জর্জিয়ান রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিয়েছে। বলল, সে এই স্পেশ্যাল ওমলেট বানিয়েছে ইউক্রেন থেকে ভাদিকের আনা কালকের ভেরি স্পেশ্যাল নুন দিয়ে। খিদে ভালোই পেয়েছিল, ওমলেট এক টুকরো মুখে দিয়ে মনে হল ইউক্রেনের নুনে নোনা স্বাদটা একেবারেই নেই, মুখে শুধু মিহি বালি টের পাচ্ছি। খুবই বিশেষ ধরনের লবণ সন্দেহ নেই, হয়তো মানানার হাই ব্লাড প্রেশারের পক্ষে উপকারী, হয়তো খুবই দুর্লভ, এইসব ভেবে নিয়ে জোর করেই তিন-চার টুকরো ওমলেট খেয়ে ফেললাম। নোনতা স্বাদ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এরকম আশ্চর্য লবণের কথা আগে কোথাও শুনিনি বা পড়িনি।

আমার মুখের চেহারা ঠিক কীরকম হয়েছিল জানি না, মানানার চোখ পড়তেই কাছে এসে কাঁটায় বিঁধে এক টুকরো ওমলেট মুখে দিয়ে এক লাফে সিঙ্কের কাছে গিয়ে থু থু করতে লাগল ও বার বার জল মুখে নিয়ে কুলকুচি করে মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলল, তুমি কি পাগল? এতক্ষণ এই বালিভরা ওমলেট খেয়ে যাচ্ছ?

তারপর চেঁচিয়ে ডেকে ভাদিককে এই মারে তো সেই মারে! ইউক্রেন থেকে শিশি ভরে বালি বয়ে এনেছ কেন?

ভাদিক গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে যা বলে গেল তার অর্থ— সে যখন কিয়েভ থেকে ট্রেনে উঠছে, তার দাদা স্টেশনে এসেছিল তাকে বিদায় জানাতে। দাদাই তাকে এই ইউক্রেনের নুন দিয়েছে। ভাদিক তো নুনই শুনেছে। বালি হতে যাবে কেন? তার দাদাই বা খামোখা কেন তাকে বালি দেবে? নুন ছাড়া এ আর অন্য কিছু হতেই পারে না।

মানানা শিশি উল্টে সবটা টেবিলে ঢেলে দেখাল— বিশুদ্ধ সাদা বালি!

জর্জিয়ায় একটা নৈশভোজ আর একটা প্রাতরাশের প্রলয়কাহিনীর মতো দুদিনের মধ্যাহ্নভোজও ভোলবার নয়। তার একটার কথা বলে এবারের মতো প্রবাসে ভোজনের ভোজবাজির সাতকাহন শেষ করব।

জর্জিয়া-তুর্কি সীমান্তে দক্ষিণ জর্জিয়ার প্রাচীন শহর আখালসিখের বাজারে আমাকে যে দেখে সেই এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে। কেউ খেতে দেয় ঘন মধু, কেউ দেয় আঙুরের থোকা, কেউ দিচ্ছে মুলো গাজর ওলকপি। আমি, বলতে কী, বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। সকলেই দেখছি মায়িয়া আর তিনার কাছে আমার ভারতীয় পরিচয় জেনে আমার সম্পর্কে নানা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। ভাষা তো বুঝছি না, কিন্তু হৃদয়ের ভাব আসলে রঙের মতো, পৃথিবীর সব দেশেই তা এক।

তারা মুলোটা কলাটা কপিটা দিচ্ছে, দুহাতে কত আর নেওয়া যায়— তিনা-মায়িয়ার হাতে আর ধরছে না। মায়িয়া কোত্থেকে একটা প্লাস্টিকের বড় ব্যাগ জোগাড় করে ফেলল। এর পর যে-ই কিছু দিতে চাইছে, মায়িয়া ব্যাগটার মুখ ফাঁক করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরছে, দাতাও আশ মিটিয়ে তার দানসামগ্রী সরাসরি ব্যাগে ফেলে দিচ্ছে।

কী ধরনের খাবার আমার পছন্দ তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও গবেষণার পর ঠিক হল একটা কোনও কাফেতে শুকনো সামান্য কিছু খেতে পেলেই আমি খুশি হব। রাস্তার ধারে একটা কাফেতে বসে মায়িয়ার জর্জিয়ানে আর তিনার তাৎক্ষণিক ইংরিজি অনুবাদে প্রশ্ন হল— হাজাপুরি আমার পছন্দ কি না। জর্জিয়ার সর্বজনপ্রিয় এই হাজাপুরি নানা ধরনের হয়। আমিই চাররকম 'হাজাপুরি'র কথা জানি। তবে হাজাপুরির প্রধান উপকরণ মাখন আর চিজ। থান ইটের মতো আকার, মাখনে চুবচুব করে ভাজা একেকটা পরোটার ওপর পুরু চিজের আস্তরণ। তারপর আবার পরোটা, আবার চিজ। আবার পরোটা, আবার চিজ— সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। নৌকোর আকারে অন্য ধরনের হাজাপুরিও আছে। যাই হোক, হাজাপুরিতে আমার ইতস্তত ভাব দেখে তিনা টেবিলের মেনু থেকে দুয়েকটি পদ ইংরিজি করে দিল। তার থেকে চিজ-মাখন ছাড়া একটা শুকনো পরোটা জাতীয় খাবার বাছলাম। ইতিমধ্যে মায়িয়া তার বাজারের ব্যাগ নিয়ে উঠে গিয়েছিল। একটু পরে ফিরে এল, তার পিছনে একজন পরিচারিকা (ইনিই এই কাফের মালকিন) , বাজারের সেই গাজর মুলো ওলকপি কেটে কাঁচাই প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। সবজিগুলোর সজীব লাবণ্যে মুগ্ধ হই।

চিজ-মাখনহীন গরম পুরু পরোটাও এসে গেল। ভেতরে ছুরি চালাতেই প্লেটই বুঝি ভেসে যায়! গলানো মাখন নাকি? তিনা সান্ত্বনা দেয়, মাখনও নয়, চিজও না, পরোটার পেটে ভরা আছে গরুর চর্বি, চারদিক থেকে পরোটার পুরু দেওয়াল দিয়ে এটা আটকানো ছিল, ছুরি চালালে গলানো চর্বি তো জলের মতো বেরিয়ে আসবেই, খেয়ে দেখো, চমৎকার! এটা চমৎকার সে বিষয়ে সামান্যতম সংশয় প্রকাশ না করে শুধু জানালাম বাজারের লোকের ভালোবাসার উপহার তো আর নষ্ট করা যায় না, সেগুলো খেয়ে এটা আর খেতে পারব না। সুস্বাদু গাজর মুলো ওলকপি দিয়ে ভারি তৃপ্তি করেই মধ্যাহ্নভোজ সারা হল।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' শারদীয়া সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১

ছবি: লেখক

কে এই মহা-আগন্তুক?

কালীকৃষ্ণ গুহ

'কালের কষ্টিপাথর'-এর টেলিফোন পাই মাঝে মাঝে। সম্পাদক কিছু কিছু লেখার কাজ করতে বলেন আমাকে। আমি কোনওরকম কাজ-ই আর গ্রহণ করতে চাই না। অথচ তাঁর টেলিফোন পেতে ভালো লাগে। ফলে একধরনের নৈকট্যে ও দূরত্বে মিশে থাকছিল আমাদের বন্ধুত্বের পুরনো সম্পর্ক। মাঝে-মাঝে মধ্যরাত পেরিয়ে হঠাৎ কখনও আমিও পোস্টকার্ড ছেড়েছি সম্পাদক নয়, লেখক অমরেন্দ্রকে। সবই তাঁর কোনও না কোনও লেখার প্রতি আমার মুগ্ধতা। এই মুগ্ধতার শুরু প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর 'বিক্ষত অন্বেষণ' নামের কবিতার বইটি পড়ার পর থেকে। হঠাৎ তিনি একটি কাজ দিলেন আমাকে, যে-কাজটি আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেব ভাবছিলাম। কাজটি এই যে সদ্যপ্রয়াত কবি ও গল্পকার নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি গল্প বেছে দিতে হবে। কে এই নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সে-বিষয়ে সামান্য কিছু লিখতেও হবে।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে কেউ কেউ গল্পকার হিসেবে চেনেন, কেউ কেউ কবি হিসেবে, কেউ কেউ কবি-গল্পকার-চিত্রকর-ভাবুক হিসেবে এবং একজন আশ্চর্য মানুষ হিসেবে চেনেন। ১৮ অক্টোবর '১৩-তে ৭৬ বছর বয়সে মারা গেলেন তিনি। নিজেকে ছোট পত্রিকার লেখক হিসেবে প্রায় অজ্ঞাতবাসে জীবন কাটিয়ে গেলেন। তাঁর এই অপরিচয়ের আরও একটা কারণ হয়তো এই যে তিনি পরিণত বয়সে, নব্বইয়ের দশক থেকে, লেখালিখিতে প্রকৃত মনোযোগ দেন, অনেকটা আদিষ্টের মতো! কিন্তু তাঁর লেখা যখনই কোনও সংবেদনশীল পাঠকের চোখে পড়েছে তখনই তিনি শিহরিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন: কে এই মহা-আগন্তুক? বর্তমান প্রতিবেদকও এই প্রশ্ন থেকে তাঁকে পড়া শুরু করেন এবং তাঁর রচিত প্রতিটি বাক্য— কবিতায় গল্পে সন্দর্ভে আত্মজীবনীতে ব্যবহৃত প্রতিটি বাক্য— পড়তে হয় তাঁকে।

বহুকথিত আধুনিকতার চর্চার ব্যাপার এখানে প্রায় কিছুই নেই। নাগরিক বিষাদ বা উল্লাস খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর লেখায়। মনে হবে, সংসারের মাঝখানে আসন পেতে বসেছেন এই লেখক আর তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন ও ব্যাখ্যা করছেন সংসারকে, সংসারকে ঘিরে থাকা চরাচরকে, পরিব্যাপ্ত নশ্বরতাকে। যেন একজন সিদ্ধাচার্য সন্ধ্যা-ভাষায় কিছু গূঢ় রহস্যের কথা বলে যাচ্ছেন— সংক্ষেপে, আত্মমগ্ন বিস্তারে। সবই জীবনের কথা, সেখানে বাস্তবও অচেনা হয়ে যায় কখনও, কখনও কল্পনায় পরাবাস্তব মিশে গিয়ে। আপাতত এইটুকুই আমাদের বলবার কথা।

সম্পাদকের দেওয়া কাজ হিসেবে তাঁর তিনটি গল্প নির্বাচন করে দিলাম। এজন্য তাঁর কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত 'নারায়ণ মুখোপাধ্যায়' নামের স্মারকপুস্তিকার সাহায্য নিয়েছি। ঘটনাচক্রে এই স্মারকপুস্তিকাটি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। মনে পড়ছে, ২২ নভেম্বর মহাবোধি সোসাইটিতে নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় আহ্বায়ক মণীন্দ্র গুপ্ত-আলোক সরকার সহ তেত্রিশ জন প্রবীণ-তরুণ লেখক ও ভাবুকের কথায় বারবার শোনা যাচ্ছিল, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নের সময় একদিন আসবে। এই মুহূর্ত থেকে শুরু হোক সেই কাজ। সে কাজে আমাদের বন্ধু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিজেকে জড়ালেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত তিনটি গল্প

দারিদ্র

নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়েছিলাম।

অনেকদিন ধরেই সে আমাকে তার বাড়ি যাবার জন্য বলেছিল। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কোথায়ই বা যাওয়া হয়! অপিস আর বাড়ি, নয়তো কারও বিয়ে-থা উপলক্ষে যাদবপুর, দমদম, সাঁকরাইল পর্যন্ত। শ্রাদ্ধেও তাই। অসুখবিসুখ করলে হাসপাতালে অথবা তার বাড়ি। দূর হলে পত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করা ছাড়া মানব সম্পর্ক প্রতিভাসের বিষয়টি স্পর্শ পায় না।

নিকুঞ্জ, অথচ আমি জানি, গ্রামেই থাকে এবং তা বহু দূর। এত দূর থেকে সে কী করে যে ঠিক সময়ে অপিসে আসে এবং কোনওদিনই একটু আগে চলে যায় না, সকলের কাছেই একটা বিস্ময়ের বস্তু। এবং আরও বিস্ময়ের এই যে, প্রায় ছ'শো সহকর্মীর মধ্যে কেউ কোনওদিন নিকুঞ্জর বাড়ি যায়নি।

নিকুঞ্জ একদিন নিজেই বলেছিল, 'আয় না একদিন আমাদের বাড়ি'!

'দূর তো!' আমি বলেছিলাম।

'কাছে কোনটা'? নিকুঞ্জ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আমাকে একেবারে অতলে তলিয়ে দিয়েছিল। বলেছিলাম, 'নিকুঞ্জ, সবই দূর, তুই ঠিকই বলেছিস।'

সেই নিকুঞ্জর বাড়ি যাব, ঠিক করলাম। কিন্তু যাওয়া আর হয়ই না। গ্রীষ্মে ভাবি, বৃষ্টি নামুক, পৃথিবী ঠান্ডা হোক, ট্রেনে চেপে সবুজ জগতে একটা দিন কাটিয়ে আসা যাবে। একটু দৌড়োব আল ধরে, ফল ছিঁড়ে খাব গাছ থেকে, পুকুরে নেমে একটা ডুব দেব; আর বর্ষা নামলে তো কথাই নেই— ভিজব ভিজব ভিজব!

বর্ষা নামে। প্রতি বছরই নামে। কোথাও যাওয়া হয় না। নিকুঞ্জ বলে, 'সবুজ হয়ে গিয়েছে চাদ্দিক, এবার আয় একদিন।'

যাওয়া হয় না! কেন যে হয় না, ঠিক বুঝতে পারি না। হয়তো কাজ অথবা কিছু না, অথবা কিছু! আটকে যে গিয়েছি তা বুঝতে পারি না। দিন ছাড়া কিছু সরে যায় না, কিছু নড়েও না!

বর্ষা একসময় চলেও যায়। শাড়ি বদলাতে যতক্ষণ, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই যেন শীত আসে। হলুদ রোদ্দুর। বেড়াবার শ্রেষ্ঠ সময়। তবু যাওয়া হয় না। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা; পরীক্ষা শেষ হলে উদ্বেগ; উদ্বেগান্তে খরচা। জীবনযাপনের ওপর যেন কম্বলের ওপর কম্বল চাপতে থাকে।

এবার আমি এসব অভ্যাস আর বাধা অতিক্রম করে বেরিয়েই পড়লাম। কেন যেন মনে হয়েছিল— বেশি আর সময় হাতে নেই। নিকুঞ্জর বাড়ি একবার যেতেই হয়।

গরম জামাপ্যান্ট পরেছি। মাফলার আর আলোয়ান নিয়েছি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে। স্ত্রীতো হেসেই খুন— প্যান্টের ওপর আলোয়ান! তা

আমি এসব এখন আর গ্রাহ্য করি না। সংক্ষিপ্ত উত্তর— আমার শীত করে।

'গামছা?' স্ত্রী মনে করিয়ে দেয়।

'সাবান', কন্যা জুড়ে দেয়।

'ওসব কিছুর দরকার নেই, যাদের কাছে যাচ্ছি তারা দেবে এসব', আমি ব্যাখ্যা করি।

'ওদের গামছা, সাবান— এসব ব্যবহার করবে!' কন্যা বিস্ময় প্রকাশ করে।

আমি কোনও উত্তর দিই না। দিয়ে লাভ নেই। আমার ঘরে এখন প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক সামগ্রী। শুধু আয়নাটা— একখানা। এখন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ অব্দি ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখছি। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক যদি ভিন্ন হয়, সেটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেমন দাঁড়াবে; এই ভাবনা আমাকে এখন মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে।

'অ-শিক্ষিত রুচি'! কন্যা মন্তব্য করে।

তার মা তার দিকে কটমটিয়ে তাকায়। আমি বুঝতে পারি, এত দূর সে মানতে পারছে না। কিন্তু কন্যা এবং আমার পরে জন্মানো সময় আমাকে এমন কতই তো অপমান করে। আমার সয়ে যাচ্ছে। দূরে যাবার মুহূর্তে যদিও সংসারের মানুষজনের প্রতি বাড়তি একটু মমতা যেন ঝুলে পড়ে, তবু এসব আঘাত অপমান আসে বলে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ বেড়ে যায়।

হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়ে আমি ন'টা পাঁচ-এ নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে যাই। নিকুঞ্জর দুই ছেলে এক মেয়ে আছে আমি জানি। তাছাড়া নিকুঞ্জর স্ত্রী, নিকুঞ্জর মা, এক জ্যাঠা এবং একজন পালিতা বিধবাও আছে। এদের সকলের হয়, এমন পরিমাণ মিষ্টি আমি কিনে নিয়ে যাই।

স্টেশনটা ছোট। তেমন ভিড় নেই। সামান্য যা দুয়েকজন মানুষ এদিক-ওদিক ছিল তারা ট্রেনে উঠে পড়ে। নামবার যাত্রী দেখলাম আমি একাই।

নির্দেশমতো বাঁদিকের গেট দিয়ে নেমে যাই। উঁচুতে প্ল্যাটফর্ম বলে আমাকে প্রায় কুড়ি একুশটা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সিঁড়ির শেষে বাঁধানো খানিকটা চত্বর। চত্বরটা ছায়াচ্ছন্ন একটা বড় গাছের ছায়ায়। একটি মাত্র ছোট দোকান। ডাব ঝুলে আছে সামনের দিকে। ভিতরে বয়ামে চকোলেট, বেকারির বিস্কুট। দেয়ালের তাকে সাবান, গন্ধ তেল, দেশলাই এইসব।

এমন গাঢ় ছায়া দেখে আমি গাছটার দিকে চোখ রাখি। কিন্তু গাছটাকে চিনতে পারি না। কৃষ্ণচূড়া, বট বা ওজাতীয় কোনও গাছ এ নয়, আমি বুঝতে পারি।

অথচ বেশ বড় গাছ। গোড়াটা বাঁধানো। ডালে ডালে অসংখ্য ফুল আর পাখি। ঝরেও পড়ছে ফুল। তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকি। কিন্তু গন্ধটা অপরিচিত মনে হয়।

শুধু গাছ আর ফুলই যে অপরিচিত তা নয়,

তারপর থেকে মাটির পথ, মাটির ঘর, মাটির সম্পর্ক এসব ভুলে গিয়েছি। দু'পাশে দেখছি সবুজ গাছ। শীতের সবজি। নীল আকাশ। রোদে গুন গুন। আমি একাই হেঁটে যাচ্ছি। পথে আর কেউ নেই!

আশ্চর্য হয়ে দেখি— বাঁধানো চত্বরে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ বসে। তারা বিশ্রাম করছে। তারা খাচ্ছে। তারা গল্প করছে। এত মানুষ বিশ্রাম করার সময় পায়, আমি ভাবি। আমি তো গত দশ পনেরো বছরে এমন একঘণ্টা সময়ও পাইনি যখন আমি একটু সত্যি সত্যি বিশ্রাম করতে পারি। উপরন্তু, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এরকম একটা ছোট্ট স্টেশনে মানুষ এলোই বা কেন, আর এখানে এই অখ্যাত অজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে বিশ্রামই বা করবে কেন!

একদিন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়েও আমার এমনই মনে হয়েছিল। অসংখ্য নক্ষত্র যেন গোল হয়ে বিশ্রাম করছে, নিঃশব্দে গল্প করছে। সে যাক, আকাশ আর পৃথিবী তো এক না। পৃথিবীর ব্যাপারটাই একটা অস্থিরতার। আমি তাই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?'

সে কোনও উত্তর দিল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা এখানে এসেছে কেন?'

সে কোনও উত্তর দিল না।

অতএব আমি নিজের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এ একটি বিশ্বাসী বনস্পতি। বললাম, 'বিশ্বাস কী?'

'অস্তিত্ব!'

'অ-বিশ্বাস তাহলে কী?'

'অস্তিত্বের খণ্ডিত রূপ।'

'ও! এরা তাহলে কি বিশ্বাসী? এখনও বিশ্বাসী আছে, পৃথিবীতে?'

'পৃথিবী যখন আছে, বিশ্বাসও আছে।'

'বিশ্বাসের সঙ্গে পৃথিবীর থাকা না থাকা...'

'মেলানো যায় না, এই তো!'

'ঠিক তাই।'

'বিশ্বাস সুপারস্ট্রাকচার নয়,— প্রাণের গূঢ় ভূমিতে সে।'

'সংস্কার সম্বন্ধেও কি একথা বলা যায়?'

'বিশ্বাস সংস্কার নয়।'

'যাক গে, এখানে কী আছে? এত মানুষ কেন এখানে?'

'শান্তি আছে। শান্তির জন্যই এত মানুষ।'

'শান্তির জন্য মিছিল, দৌড়, সভা,— ছেড়ে এই বসে থাকা—!'

'সাবরমতি আশ্রম চেনো?— বোলপুরে ছাতিমতলা?'

'বাপ রে! সে তো দারুণ!'

কথোপকথন শেষ হয়। আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই। আমার দরকার।

আমার খুব দরকার। কিন্তু কোনও অনুসন্ধান অফিস নেই বলে খুঁজে পাইনি। এবার পেয়ে মনে মনে ভাবলাম,— বেশ, তাহলে পাওয়া গেল!

কিন্তু ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে আমি আর দাঁড়াতে সাহস করলাম না। ন'টা পাঁচের ট্রেনে আমি আসব এবং সাড়ে ন'টার মধ্যেই নিকুঞ্জর বাড়ি পৌঁছে যাব,— নিকুঞ্জ উদ্বিগ্ন হবে যে।

দায়বদ্ধতার খাতিরে এরকম বহু ভালো-লাগা আমি কাটিয়ে গিয়েছি। আজও কাটালাম। নির্দেশমতো বাঁদিক ধরে হাঁটতে লাগলাম। আমার মনে হল— ছায়াটুকু তখনও লেগে আছে। হাজার রোদ্দুরেও সে ছায়া মুছে যাচ্ছে না।

বস্তুত এ একটি আসল গ্রাম। মাটির রাস্তা। মাটির রাস্তায় আমি বহুদিন হাঁটিনি। কবে সেই বাগেরহাট থেকে মঘিয়া গ্রামে হেঁটে গিয়েছি! তারপর থেকে মাটির পথ, মাটির ঘর, মাটির সম্পর্ক এসব ভুলে গিয়েছি। দু'পাশে দেখছি সবুজ গাছ। শীতের সবজি। নীল আকাশ। রোদে গুন গুন। আমি একাই হেঁটে যাচ্ছি। পথে আর কেউ নেই!

'আরে এই তো!' নিকুঞ্জ দেখি খদ্দরের চাদর জড়িয়ে ধুতি পরে তার বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে। সে হাসছে।

একটু দ্রুত হেঁটে তার সামনে দাঁড়াতেই সে জড়িয়ে ধরল। গাছের গন্ধ পেলাম তার গায়। বললাম, 'বাড়িতেই আছিস, অথচ স্টেশন অব্দি একবার যেতে পারলি না?'

'কেন, তোর চিনতে অসুবিধে হয়েছে?'

'না, তবু!'

'তবু? শোন, একা কিছুটা পথ হাঁটা অভ্যেস কর।'

আড়চোখে একবার তাকালাম ওর দিকে। কিছু বললাম না।

সামনেই নিকুঞ্জর টিনের চালা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেশ চওড়া উঠোন। দু'পাশে গাঁদার ঝোপ। ফুলে ফুলে একাকার। একটুখানি সরু পথ। চলতে ফিরতে ফুলের, পাতার,

ডালের ছোঁয়া বাঁচানো যাবে না। এবং এর মধ্য দিয়ে দেখি— এক মধ্যবয়সি মহিলা চারদিক আলোকিত করে হাসতে হাসতে আসছে। তার কপালে চওড়া সিঁদুর, শাড়ির পাড় লাল, হাতে পুরু শাখা। কিন্তু গায়ে ব্লাউস নেই। আঁচল কাঁধের ওপর রেখে সে গ্রাম্যের মতোই আসছে।

হাত জোড় করে আমি তাকে নমস্কার জানাই। প্রতিনমস্কারের পরিবর্তে সে আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে।

নিকুঞ্জ আমার বন্ধু। আমার সমবয়সি। তার স্ত্রী সঙ্গে আমার সম্পর্কে তো মাতৃত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু সে কি একটা ব্লাউস গায়ে দিয়ে আসতে পারত না! তার তো শরীরও তেমন পড়ে-থাকা অবস্থায় আসেনি। অথচ সে এসব কিছুই গ্রাহ্য না করে আমার হাত চেপে ধরল এই আলুথালু বেশে— আমি ঠিক কিনারা করতে পারি না।

কিন্তু সে আমার হাত ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলল, বলল, 'বসো।'

আমি বসলাম বিছানায়।

বসতেই নিকুঞ্জর মেয়ে অতসী ছুটে এলো যেন কত যুগের চেনা। আমি জানতাম— অতসী বি.এ পাশ করেছে এ বছর। ভারি সুন্দরী, তবে এত সুন্দরী হবে তা ভাবিনি।

প্রণাম করল অতসী। আশীর্বাদ করলাম মনে মনে। মাথা তুলে সে আমার গা ঘেঁষে বসল। নাকে বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। আমি বললাম, 'বকুল ফুলের গন্ধ!'

সে হাসল।

এরপর নিকুঞ্জর দুই ছেলে স্নেহময় স্বপ্নময় কাছে এল। একজনের হাতে হাতপাখা, অন্যের হাতে ঠান্ডাজল।

অতসী আমাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে রইল।

আমি বললাম, 'ঠান্ডা তো, হাওয়ার দরকার কী?'

'হাতপাখার হাওয়া...শীত গ্রীষ্ম সব সময়ই তো...।'

'সব সময়ই তো'...কী, আমি জিজ্ঞেস করিনি। করা গেল না। বোধহয় কোনও কোনও পরিবেশে যা-যা উঠে আসে তাই-ই গ্রহণ করার একটা দায় থাকে। এবং যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়।

'জল খাও', নিকুঞ্জর বউ বলে।

'খাও'! আমি চমকে উঠি। মেয়েমানুষ স্বামীর বন্ধুকে, বয়স্ক বন্ধুকে প্রথম সাক্ষাতেই 'তুমি'!

জলটুকু আমি খেলাম এবং বুঝলাম— আমার বহুদিনের পিপাসা কেন অপেক্ষা করছিল।

এরপর এল জলখাবার। সামান্য আয়োজন— মুড়ি নারকোল গুড়। সবাই— আমি, নিকুঞ্জ, স্বপ্নময়, স্নেহময়, অতসী, জ্যাঠা, এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, নিকুঞ্জর স্ত্রীও আমাদের সঙ্গেই খেতে বসল। তাঁকে আমরা কেউ বলিনি, আসুন এক সঙ্গে খাই। এক চিরন্তন স্বাভাবিকতায়, সহজিয়া সত্তার আবেদনে সে এসে বসেছে। এই স্বাভাবিকতা সে পেল কোথায় এবং কেমন করে যে রক্ষা করেছে, আমি তার কোনও কিনারা করতে পারি না। আরও একটা জিনিস আমি লক্ষ করি— নিকুঞ্জর স্ত্রীর গায়ে এখনও কোন ব্লাউস নেই!

মনে মনে ভাবি— তোমাদের মা কী! তার পরনে লালপেড়ে শাড়ি। চোখমুখে লক্ষ্মীশ্রী, জ্যান্ত মাতৃত্ব, সে এই দিঘি... এতগুলি সন্তানের জননী এই দিঘি সাঁতরে পার হয় এবং তা কয়েকবার!

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, হঠাৎ এসে পড়েছি বলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেনি, এক্ষুনি পরে নেবে হয়তো, কিন্তু হঠাৎই বা কেন! আমি তো খবর দিয়ে এসেছি এবং আসার পরও আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। মহিলা তো সময় পেয়েছে। আমার কেমন যেন একটা সংকোচ কাজ করছিল। কিন্তু মহিলা নির্বিকার। কাজকর্মের মাঝে মাঝেই তো তার শাড়ি অবাধ্য হচ্ছে এবং রহস্যময় সেই ক্ষীরভাণ্ড উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তার তো তেমন বয়েস হয়নি যে ছেঁড়াকাঁথা হয়ে গিয়েছে। অস্বস্তি! ঘোর অস্বস্তি কাজ করছে। অস্বস্তি অতসীকে নিয়েও। সে তো কন্যার মতোই গা ঘেঁষে বসে। 'কন্যার মতো', কন্যা, আত্মজা তো নয়।

'কী হল, খাও!' নিকুঞ্জর স্ত্রী ঝরায়।

আমি বড় একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিই।

হঠাৎই সে তার এঁটো মুড়ি হাতভরে এগিয়ে এনে আমার মুখের কাছে ধরে।

মাতৃত্ব তার সর্বত্র ঝরতে থাকে। সমবয়সি এমন মা, এর স্বাদই আলাদা। প্রাণভরে আমি তা খাই। এঁটো কী? এঁটো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ। এঁটো তো আসলে সবকিছুই— জল, বাতাস, রোদ, প্রাণ,— সবকিছুই। এই বিশাল এঁটোর খবর আমরা রাখি না সব সময়, তাই এত সব।

এরপর আমরা সবাই মিলে নিকুঞ্জর বাগান দেখতে যাই। এই বাগান দেখতে আসা। বহুদিন ধরে নিকুঞ্জ এই বাগানের কথা বলেছে। নিকুঞ্জর বাগান। নানারকম সব ফলের গাছ। কিন্তু তলাটা পরিষ্কার। কতরকম লতা যে তার অন্ত নেই। অতসী প্রায় সব কটি গাছের গায়ে হাত দিচ্ছে, পাতায় গাল ঠেকিয়ে অনুভব করছে। ওর মা কথা বলছে গাছের সঙ্গে। নিকুঞ্জ আমার পাশে থেকে সব চিনিয়ে দিচ্ছে— কবে, কার জন্ম; কী কষ্টে তাদের লালন করা হয়েছে, এইসব।

ঘুরতে ঘুরতে দেখি— বাগানের মাঝখানে একটি চমৎকার দিঘি। 'স্নান করব', আমি প্রায় স্বতোৎসারিত উচ্চারণ করি।

'এখানে সবাই স্নান করি, তুইও করবি', নিকুঞ্জ জানায়।

'সাঁতার জানো, কাকা'? অতসী জিজ্ঞেস করে।

'মা এই দিঘি সাঁতরে যেতে আসতে পারে কয়েকবার', স্নেহময় খবর দেয়।

'ও-পার!' আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

'নিমেষে!' স্বপ্নময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

মনে মনে ভাবি— তোমাদের মা কী! তার পরনে লালপেড়ে শাড়ি। চোখমুখে লক্ষ্মীশ্রী, জ্যান্ত মাতৃত্ব, সে এই দিঘি... এতগুলি সন্তানের জননী এই দিঘি সাঁতরে পার হয় এবং তা কয়েকবার! 'নিকুঞ্জ!' আমি শুধু এইটুকুই উচ্চারণ করতে পারি। 'কী, সাঁতার নিয়ে কথা হচ্ছে?' তাকিয়ে দেখি, সেই রহস্যময়ী প্রতিমা আমার সামনে দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইছে— এ কোনও বিস্ময়ের বস্তুই নয়।

'আপনি সাঁতরে ওপার... এত বড় দিঘির ওপার যেতে পারেন?'

উত্তরে সে আমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে নেয়। হাসে, বিশুদ্ধ শুচিময় সেই হাসি। আমার চোখ ফেটে জল আসে। আমি কাঁদতে পারলে কিছুটা প্রকাশ করতে পারতাম।

এরপর সে তেল মাখাতে বসে।পা ছড়িয়ে দিয়ে হাতের চেটোয় তেল নিয়ে আমার গায় তেল মাখায়। ছেলেমেয়ে, স্বামী সবাইকে সে একইভাবে তেল মাখায়। কোথাও তার অস্বস্তি নেই, সম্পর্কের ভিন্নতা নেই, সামাজিক রেখা নেই। যেন সে এই পৃথিবী। সবাই তার সৃষ্টি।

আমি কাঁপতে থাকি। আমার অভ্যাসের দায় নীল হয়ে ওঠে। আমার রোমগুলো শুয়োপোকার মতো দাঁড়িয়ে যায়। আমার এত দিনের জীবনচর্যা ভেঙে পড়তে থাকে। আমাকে যেন সবকিছু অতিক্রম করে যেতে থাকে।

সবাই মিলে আমরা স্নান করি। নিকুঞ্জর স্ত্রী আমার গায়ে গামছা ডলে ডলে ময়লা তুলে দেয়। আমার শরীরের সর্বত্র তার হাত চলতে থাকে। ময়লা এবং উত্তেজনা মিলে আমার

অস্তিত্ব একটা ভয়ঙ্কর সংযমাতিক্রমী বিন্দুতে টলমল টলমল করতে থাকে। সে তা বোঝে না, এ হতে পারে! এতগুলি সন্তানের জননী সে। তবু সে এ সব যেন মনে রাখে না। জলের মতোই যেন সে। উদাসীনা, নিরাসক্তা জগৎধর্মের লাবণ্যময়ী দেবী যেন সে।

'সব ময়লা সাফ করলে আমি থাকব কী নিয়ে'? গলা অব্দি জলে দাঁড়িয়ে আমি আর্ত নিবেদন করি।

কিন্তু সে-কথায় সে কান দেয় না। সে সাঁতরায়। নিবিড়ভাবে সাঁতরায়। এ পার ওপার সে জলদেবীর মতো যাতায়াত করতে থাকে। তার চুল, দেহ, আলোর মতো জ্বলতে থাকে। জলকে তার সংসার, তার সত্তা, তার দর্শন বলে মনে হয়। জল সে ভাঙে। জল আবার নিজেকে জুড়ে নেয়। সে তবু, সে তবু তার মধ্য দিয়ে বেগে বয়ে চলে যায়। তার গলার সোনার হারগাছা জলে ঝিকিয়ে উঠে জলেই মিলিয়ে যায়। তার চুল শ্যাওলার মতো ভাসে। সে যে মানবী অনেক সময় তা বোঝাই যায় না।

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এসব দেখি। বিনম্রতায়, জলের নরম অস্তিত্বে আমি কেমন যেন হয়ে যাই। দীর্ঘক্ষণ বাদে সে যখন উঠে আসে, তার সারা শরীর সিক্ত। কাপড় লেপ্টে আছে। রোদ পড়েছে গায়ে। পায় আলতার ভিজে রেখা। সিঁথিতে ভিজে সিঁদুর। আমার একটা গাঢ় প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় এবং মনে মনে একটা নিবিড় প্রণাম সেরে নিই।

এরপর আমরা মধ্যাহ্নাহার সেরে নিই। অতি সাধারণ সব পদ। কিন্তু সাধারণাতিক্রমী তার স্বাদ। মধ্যাহ্নাহারেও সে আমার পাশে বসে। এক পাশে সে, এক পাশে অতসী, সামনে নিকুঞ্জ, জ্যাঠা এবং দুই ছেলে। খেতে খেতে অনায়াসে সে এক গরাস আমার মুখে তুলে দেয়, আমার পাত থেকেও এক গরাস মুখে দিয়ে বলে, 'নুন মাখোনি!'

দুপুরে আমরা গান শুনি। সে সবরকম গান জানে। উচ্চাঙ্গ সংগীত, কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক সব সে শোনায়। অতসী ও তার ভাইয়েরাও চমৎকার গায়। নিকুঞ্জও যে এত সুন্দর গাইতে পারে, আমি জানতাম না।

গান শুনতে শুনতে কখন যে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে আমি টের পাইনি। হঠাৎই দেখি— সন্ধ্যা। আমি চমকে উঠি— আমাকে যে ফিরতে হবে!

কথাটা আমি নিকুঞ্জর বউকেই জানাই।

কিন্তু একথা জানাতে গিয়ে আমার চোখের সামনে কাচের প্রতিফলনের মতো ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। অর্থাৎ আমি ছুঁতে পারছি না, অথচ ঘটছে— এমন সব ঘটনা। আমি দেখি— সে যেখানে বসে ঘাড় কাত করে গান করছিল ওখানটা থেকে সে হাল্কা উঠে দাঁড়ায়। তারপর সর সর সর সর সর করে সরতে থাকে যেন কেউ তার জৈবিক অভ্যাস ছাড়িয়ে একটা পাথুরে মূর্তির মতো যত্নে সরিয়ে নিচ্ছে। ঘরের এক কোণে সে স্থির হয়। তার মাথায় কে যেন লাল পাড় শাড়ির বোধবুদ্ধির অতীত অবগুণ্ঠন পরিয়ে দেয়। সে নড়ে না। নিশ্চল। সে পাথর। অথচ তার গা দিয়ে রক্তের দাগের মতো কতগুলো দাগ একটা ভাষা নিয়ে দাগিয়ে উঠেছে: আমাকে— যে— ফিরতে— হবে—

এর কোনও মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারি না। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমার ভয় করে। আমি ভাবি— আমি কি কোনও প্রেতলোকে এসে পড়েছি!

তবু আমি ঠিক করি— ওকে একটা প্রণাম করব। মনে মনে বলি— সারাদিন তুমি নিয়ম ভেঙেছো, এবার আমি ভাঙব।

আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করি। তার পা'কে পা মনে হয় না, যেন মাটি। মাটির পা। পৃথিবীর পা।

এক ঝটকায় আমি বাইরে গেটের সামনে চলে আসি।

অন্ধকার! নিশ্চুপ চারদিক। নিকুঞ্জর ঘরও অন্ধকার। কোথাও কোনও আলোর চিহ্ন নেই। সেইসঙ্গে গাঢ় শীত। বহুদূর পর্যন্ত হিম পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু গেটের কাছে খালি গায়ে সাদা পায়জামা পরে দেখি নিকুঞ্জ দাঁড়িয়ে তার হাতে একটা সবুজ ডাব। ডাবটা নিকুঞ্জ আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এটা নিয়ে যা'।

কোনও কথা না বলে আমি তুলে নিই। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। পিছন ফিরে একবারই শুধু নিকুঞ্জকে বলি, 'অতসী স্বপ্নময় স্নেহময়দের বলিস, আমি চললাম। ওরা কোথায়?'

'শীতে।' কে যেন উত্তর দেয়।

রুদ্ধশ্বাসে আমি হাঁটতে থাকি। আমার পায়ে জুতো নেই, ফেলে এসেছি। নিঃশব্দ প্রকৃতি। মাটির পথ। আমার হাতে সবুজ ডাব। কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু সারাদিনের ব্যবহারটুকু ছাড়া।

হঠাৎ দেখি— এয়োতির মতো একটা চাঁদ উঠল। চাঁদটা যেন নির্ভার হয়ে উঠে গাঢ় হয়ে গেল। এক পলক দেখতে গিয়ে আমি আশ্চর্যজনকভাবে দেখলাম— আমার হাতে ডাবটা নেই!

কান্না পাচ্ছিল আমার। অন্ধকারের মতো কান্না। নিকুঞ্জ এবং তারা আমাকে যা যা দিল তার কিছুই রাখতে পারলাম না!

তিনি

তিনি আসেন।

রোজ যে আসেন তা নয়; মাঝে মাঝে আসেন। কবে, কোন মাসে, কখন আসবেন— খবর দেন না। কেউ জানেও না কখন তিনি আসবেন। এতটুকু জানতে দেন না কাউকে যে তিনি আসছেন।

অথচ তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শোরগোল পড়ে যায়। শহরতলির এই অঞ্চলে তখন সকলের মুখে মুখে ফেরে— তিনি এসেছেন। গুপীর চায়ের দোকানে সেদিন তামিলনাড়ুর ইলেকশান, নেহেরু গোল্ড কাপ, হাশমি হত্যা বা শ্রীদেবীর আলোচনা পেছিয়ে পড়ে। সেদিনের অগ্রবর্তী খবর একটাই— তিনি এসেছেন! আঞ্চলিক লাইব্রেরিতে সেদিন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস, রমাপদ চৌধুরির একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তি, ভূপালে আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনের পেছনে আসল উদ্দেশ্য সব চাপা পড়ে যায়। কেউ সেদিন মনোযোগ দিয়ে নোট নিতে পারে না। কেউ সেদিন পত্রিকায় রঙিন বিজ্ঞাপনও খুঁটিয়ে দেখতে পারে না।

মোড়ে মোড়ে ছেলেরা সেদিন যতটা সম্ভব আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করে। 'দূর শালা... কিছু হবে না এ জীবনে...' জাতীয় মহাকাব্যের এই লাইনটি সেদিন কেউ একবারও উচ্চারণ করে না।

সেদিন বেশ রোদ ওঠে। আকাশের কোণে গগন ঠাকুরের আঁকা মেঘের মতো মেঘ থাকে। অথচ মেঘলা হয় না। পরনিন্দুক হীনমন্য শীত যদি আগের দিনও জাঁকিয়ে ছিল, তিনি আসতেই সেই শীত উপভোগ্য, মনোরম হয়ে ওঠে।

একরকম ঝকঝকে বৃষ্টি আছে না, যাতে অনেক কিছু জুড়োয় অথচ স্যাঁতসেঁতে ভাবটা থাকে না, সেই বৃষ্টি শুরু হয় তিনি এলে। তিনি এলে সেই নরম উজ্জ্বল বৃষ্টি চারদিক থেকে ঝেঁপে আসে।

বরাবরই তাঁর আসা সাইকেলে। সবুজ

রঙের সাইকেল চড়েন তিনি। পেছনে লাল রঙের ক্যারিয়ার। বেল বাজান যেন ঝিরঝির শব্দ হয়। একদল ছেলেমেয়ে তাঁর সাইকেলের সামনে পেছনে । একসঙ্গে তিন চারজনকে তিনি সাইকেলে তুলে নেন। খুব আস্তে চালান যাতে কেউ পড়ে না যায় এবং যারা সাইকেলে ওঠেনি, তারা খুব পেছনে না পড়ে।

ছেলেমেয়েরা সবাই বলে, 'বেলটা একটু বাজাও।'

তিনি বেল বাজান। ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ হয়। ওরা হাততালি দেয়। কলকল করে হাসে। আনন্দে মেতে ওঠে। হাসতে হাসতে হাততালি দিতে দিতে সবাই তাঁর সঙ্গে সারাটা অঞ্চল ঘুরে বেড়ায়।

তিনি অথচ মধ্যবয়সি মানুষ। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে তাঁর। মাথার চুল দীর্ঘ কিন্তু একেবারে সাদা। চুল সাদা হলেও চোখমুখ ঢলঢল করে যেন তিনি তিরিশ ছাড়াননি। সবুজ ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি পরেন। চোখে সামান্য পাওয়ারের চশমা পরলেও আয়ত চোখ বেশ বোঝা যায়। চোখদুটো তাঁর ভিজে ভিজে থাকে সবসময়। লম্বাটে মুখে তাঁর কাঁচাপাকা দাড়ি। গাম্ভীর্য থাকে বলে তা তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন; কিন্তু তিনি সেই গাম্ভীর্য ভাঙেন। নিজের গাম্ভীর্য নিজেই ভাঙেন।

যখনই আসেন তিনি দু হাতে বিলোন। তাঁর সাইকেলের হ্যান্ডেলে দুটো চমৎকার কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো থাকে। সেই ব্যাগ থেকে তিনি বের করেন আর দু হাতে বিলোন। বাচ্চারা মুঠিভর্তি করে তা গ্রহণ করে, খায় এবং খুশিতে ঝকমক করে ওঠে। শুধু বাচ্চারা নয়, বয়স্করাও কেউ হাত পাতলে তিনি তারও মুঠোভর্তি করে দেন; তারা খায় এবং মুখ থেকে সংসারের লাঞ্ছনার দাগ মুছে ফেলে। ডাবের জলের মতো নিজস্ব কলকলানিতে মুখর অথচ চাপা সুখে আচ্ছন্ন হয়।

তিনি যে সাইকেলেই চক্কর মারেন, কোথাও নামেন না, দাঁড়ান না— তা নয়। মাঝে মাঝে তিনি নামেন। এ অঞ্চলে মুসলমান পাড়া ছাড়িয়ে গিয়ে বিশাল একটা মাঠ আছে। সেখানে ধান চাষ হয়। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্য ডোবা দেখেন আর ছেলেমেয়েদের বলেন, 'দেখে নে, দেখে নে, ডোবা না দেখলে উদয় দেখতে পাবি নে!' মাঠের আল ধরে তিনি দৌড়োন। তাঁকে দৌড়োতে দেখে বিষাক্ত সাপেরা নিজেদের গলিয়ে জল করে দেয়। মাঠের প্রান্তে এক ভণ্ড সাধু বলেছিল, 'ওই জলের সবটুকু বিষ!'— তিনি সেই বিষ সঙ্গে সঙ্গে আঁজলা ভরে পান করেছিলেন।

কিচ্ছু হয়নি তাঁর।

ছেলেমেয়েরা সেই জল পান করে বলেছিল, 'কী ঠান্ডা!'

জন্তুর হৃৎপিণ্ডের মতো একখানা চাঁদ উঠেছিল সেদিন। ভীষণ শীতও ছিল। দুপুর থেকে ঠান্ডা হাওয়া আর কালো শীত যেন জাঁকিয়ে বসেছিল। মেঘ ছিল একটু একটু। পথঘাটে রুক্ষতার সঙ্গে শীতের কাঁপুনি মিলে একটা জঘন্য অবস্থা।

এছাড়াও তিনি দাঁড়ান কোনও কোনও বাড়িতে। একবারে আকস্মিকভাবে সাইকেল থামিয়ে গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি ঢুকে যান কোনও বাড়ির একেবারে অন্দরমহলে।

সেদিন তিনি মথুরা চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে হঠাৎই এভাবে উপস্থিত হলেন। মথুরাবাবু সেই ৭৪ সন থেকে পঙ্গু হয়ে আছেন। চোখের সামনে একমাত্র সন্তানকে গলা কেটে খুন করার পর থেকে তিনি পঙ্গু হয়ে আছেন। মথুরাবাবুর স্ত্রীকে আমরা পিসিমা বলি। তিনি ঘরে ঢুকে আগে মথুরাবাবুর কাছে গেলেন। তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। নানারকম ফল বের করে দিলেন আর একটা টেপরেকর্ডার। নব ঘুরিয়ে নব ঘুরিয়ে বাজিয়ে শোনালেন ফিরোজা বেগমের গান। মথুরাবাবু বললেন, 'কে গাইছে?'

গানের ক্ষেত্রে কে গায়ক বা গায়িকা— এ কোনও বড় কথা নয় বলে তিনি সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি পিসিমাকে বললেন, 'আপনিও শুনবেন।'

'সবাই শুনব', পিসিমা খুশি হয়ে জানালেন।

'দুটো খেয়ে যাবেন এখানে?' পিসিমা সম্মতি চাইলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একখানা কাঠের পিঁড়ি, কাঁসার গ্লাসে জল, কাঁসার থালায় লালচে ভাত, লাউঘণ্ট, হিঞ্চে, পুঁটি মাছের ঝোল, চালতার চাটনি আর খেজুর রসের পায়েস থাকবে, সেই সঙ্গে একজনা কেউ শাঁখা হাতে, সিঁদুর পরে, আলতা পায় দিয়ে, ঢাকাই শাড়ি পরে সামনে বসে তালপাতার পাখায় হাওয়া দেবে আর বার বার অনুরোধ করবে, 'আর দুটো ভাত দিই'— হলে মন্দ হতো না!'— এ কথা বলে তিনি কলকল করে হাসেন।

'তা হবে!' পিসিমা সম্মতি জানান।

কিন্তু তিনি দাঁড়ান না। তিনি হাসতে হাসতেই চলে যান।

বেশ কয়েক বছর ধরেই এরকম চলছিল। ঋতুর মতো তিনি আসেন, যান, কারো কোনও সন্দেহ সংশয় ছিল না তাঁকে ঘিরে। কিন্তু, এখন আর তা চলল না। মানুষ এখন সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন কিছু জোর করে আদায় করতে চাইছে, যেমন মাঠের বুকেও রাসায়নিক সার দিয়ে মাঠকে হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে বেশি ফসল দেবার জন্যে জোর খাটাচ্ছে। সেইভাবেই সেদিন একজন বেকার ছেলে ঠিক করল— তাঁকে ধরবে এবং কিছু আদায় করে ছাড়বে। জোর করেই আদায় করবে।

জন্তুর হৃৎপিণ্ডের মতো একখানা চাঁদ উঠেছিল সেদিন। ভীষণ শীতও ছিল। দুপুর থেকে ঠান্ডা হাওয়া আর কালো শীত যেন জাঁকিয়ে বসেছিল। মেঘ ছিল একটু একটু। পথঘাটে রুক্ষতার সঙ্গে শীতের কাঁপুনি মিলে একটা জঘন্য অবস্থা। বিকেলে সেদিন একটি যুবতী আত্মহত্যা করেছিল, একটি বালক ক্রাচে ভর করে হেঁটে গিয়েছিল এবং একজন গৃহবধূ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দাউদাউ করে দৌড়ে গিয়েছিল।

সেদিনই তিনি এলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ সেদিন টেরই পেল না যে তিনি এসেছেন। তাঁর সাইকেলও সেদিন রিমঝিম রিমঝিম করে বেল বাজায়নি। নালাপুকুরের পাড় ধরে জোড়া-বটতলায় সাইকেলের চাকা পড়তেই ছেলেরা তাঁকে ঘিরে দিল। জোর করে তাঁকে ফ্যান কোম্পানির পাশ দিয়ে গোবরঝুড়ির মাঠের পাশে খাদ্য দপ্তরের গুদামের কাছে নিয়ে গেল। শুধু অন্ধকার ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার বা সাহায্য করার কেউ ছিল না।

সূচি অনুযায়ী কাজ শুরু করতে গিয়ে তারা দেখে— কালো বরফের একখানা গূঢ় চাঁই তাদের সামনে। তিনি নেই!

তারা বিস্মিত হয়।

তারা এদিকে ওদিকে খোঁজে।

তারা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

তাদের মধ্যে থেকে কোনও সূত্র বেরিয়ে আসে না। তারা বিমূঢ় অবস্থায় যখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তখনই কান্নার একটা আঁচড় তারা উপলব্ধি করে।

চারিদিক তাকায় তারা। চারিদিক দেখে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। তারা একটা মাঠের মাঝখানে যায়। সেখানে এই রাতে তারা গোল হয়ে পৃথিবীর মতো বসে। একটা বৃত্ত ফুটে ওঠে। তারা তবু খোঁজে, তিনি তাহলে গেলেন কোথায়? কান্নার সেই আঁচড়টা রি-রি-রি করতে থাকে।

অবশেষে তারা আবিষ্কার করে— তারাই কাঁদছে।

অবুঝ বৃষ্টিপাত

'আমি কে? আমি কে?'— এই প্রশ্নের যেমন মীমাংসা আছে তেমনি আবার নেইও। মীমাংসার সূত্র মেলে যখন আমার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তুলে ধরা যায়। এতে যে সূত্রটি মেলে তাতে বহু কিছু স্পষ্টও আবার হয় না। সেক্ষেত্রে, আমার একটি ফটো থাকলে আরও খানিকটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু, এতেও মুশকিল হয় আমার চরিত্র নিয়ে।

কারণ, ফটো দেখে কোনও কোনও বিজ্ঞজন আমার স্বভাবের একটি রূপরেখা উপলব্ধি করলেও এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। আমাদের জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এই ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত করে দেয়। আর, যা যা অমীমাংসিত থেকে যায় তার পরিমাণ এত বেশি যে এক এক সময় মনে হয়— এই অমীমাংসিত আমিই প্রকৃত আমি।

আমার বাড়ি যাবার পথে একটা ছোট্ট দোকান আছে। দোকানটি ছোট হলেও এ এক বিচিত্র জিনিস বলে আমার একদিন মনে হয়েছিল। মানে, দোকানটিকে আমি রোজই দেখি। জিনিসপত্তর কিনি। মালিকের সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলি। কিন্তু, কোনওদিনই এর স্বাভাবিকতা আমার কাছে অস্বাভাবিকতায় হাজির হয়নি। অর্থাৎ, এর অমীমাংসিত রূপ আমি বুঝতে পারিনি। একদিন, বেশ রাত হয়েছে, দুলে দুলে বৃষ্টি হচ্ছে চতুর্দিকে, ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষজন, বৃষ্টির ছাট আসবে বলে আশপাশের বাড়িগুলির সমস্ত জানালা বন্ধ। এজাতীয় সময়ে বরাবরই আমার একটু বাইরে বেরোবার অপ্রতিরোধ্য একটা টান কাজ করে। আমার অমীমাংসিত রূপই হল এটা। ফলে, আমি বলতে পারব না কেন এমনটা হয়।

তো, একটা ছাতা নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। বাইরে বেরোতে আমি কোনও পোশাক পরিবর্তন করিনি। কারণ, এই রাত, পথে যখন কোনও মানুষজন থাকার সম্ভাবনা নেই, উপরন্তু বৃষ্টির যা মেজাজ, ভিজে যাব ছাতা নিয়েও, এ আমি জানতাম। ফলে, আমার দেহের নীচের দিকে লুঙিই সার; উপরের দিকটা উন্মুক্তই রইল। থাক্, কী আর হবে— এরকম ভেবে আমি দরজা খুলে বাইরে থেকে তালা লাগালাম। ঘরে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা কেউ কিছু টের পেল না।

সদর দরজা খুলে বাইরে পা রাখতেই দেখি মামা এই বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে আমার গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মামা মানে এখানকার সমস্ত কুকুরদের অভিভাবক সে। এবং সে যে মামা তার কারণ, তাকে কেউ কোনওদিন এ অঞ্চলের কুকুরীদের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে দেখেনি। কুকুর কুকুরী এ অঞ্চলের সবাই তাকে যে মান্যগণ্য করে তা বেশ বোঝা যায়। বললাম, 'আমি রে, চোরটোর নই।'

শুনে ও খুশি হল। কিন্তু, আমার এই প্রকার সাজপোশাক দেখে ওর একটু সন্দেহ হল তা বোঝা গেল ওর নাক কুঁচকোনো দেখে। কিন্তু, ও দাঁড়াল না। চলে গেল বৃষ্টির মধ্যে। একটু কষ্ট হল আমার।

ধীরে ধীরে হেঁটে আমি দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলাম দোকানটার ঝাঁপ তখনও বন্ধ হয়নি; ভেতরের আলোও নেভেনি।

> ডান হাত এগিয়ে দিয়েছিলাম। বাঁ-হাত দিয়ে মৌমাছিটাকে সরাতে গিয়ে দেখি, আমার হাতে আরও আরও সব মৌমাছিরা এসে বসেছে। এরা কেউ দংশাচ্ছে না। বসেছে মাত্র। এ এক অভাবনীয় দৃশ্যই বটে। আমি ভাবি, চাক বাঁধবে না তো!

প্রথমটায় আমার মনে হল, দোকানটা যে খোলা রয়েছে এতে খুব সুবিধে হল। এখন এখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে কড়া একটা সিগারেট খেতে খুবই ভালো লাগবে।

রাস্তার ওপাশে দোকানটি। আমাকে যেতে হলে রাস্তা ডিঙোতে হবে। এই রাতে রাস্তা পার হওয়া কোনও সমস্যা নয়। উপরন্তু, এ রাস্তাটি দিনের বেলায়ও খুব যে ব্যস্ত তা নয়। এ হল পাড়ার ভিতরের রাস্তা, প্রাইভেট কার, সাইকেল-রিকশা ইত্যাদি চলাচলের জন্যই।

কিন্তু, অস্বাভাবিক বৃষ্টির দরুন পথে বেশ জল। জলে স্রোতও আছে। স্রোতের সঙ্গে এই অন্ধকারেও দেখছি বহু কিছু ভেসে চলেছে। যেন নরক। নরকের স্রোতস্বতী।

বেশ একটু ঠান্ডা অনুভূত হল জল ডিঙোতে। বেশ ঘন জল।

একবারে মুখোমুখি দোকানটা। দোকানটার ওপারে আবিশ্ব অন্ধকার। অন্ধকার দীপমালা। দোকানের ঝাঁপ বাঁচিয়ে ছাতা হেলিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'জগদীশ, একটা সিগারেট দাও।'

দোকানটা বেশ উঁচু। চারটে উঁচু পায়ার উপর দাঁড়িয়ে। অস্থায়িত্বের লক্ষণ। ভিত গেঁথে ঘর তৈরি নয়। পরিসর খুবই ছোট। সামনের দিকে পর পর বয়ামভর্তি নানারকম লজেন্স। বাঁ দিকে ঠান্ডা বাক্সে কোল্ড ড্রিঙ্কস। ওপরে তারের ঝুড়িতে ডিম। এছাড়াও নানারকম সামগ্রীতে ঠাসা দোকানটি। সারাক্ষণ ভিড় লেগেই থাকে। জগদীশ মানে দোকানের মালিক বসে মাঝখানটায়। বয়াম ও দ্রব্যসামগ্রী ছাড়িয়ে তাকে দেখা যায়। কিন্তু এখন রাত্রি ছাড়া কোনও খদ্দের নেই।

সে ওখানেই আছে এবং যে অবস্থায় তাকে প্রতিদিন দেখি সেই অবস্থায়ই সে আছে এমত বিশ্বাসেই সিগারেট চেয়েছিলাম তার কাছে। কিন্তু, সাড়া পেলাম না। সিগারেট যে পেলাম না তা তো বলাই বাহুল্য।

দেখলাম— জগদীশ যেখানটায় বসে সেখানে স্ট্যান্ডের উপর একটা আলো জ্বলছে, যা আমার অভিজ্ঞতায় একেবারেই অভিনব। কারণ এ দোকানে আলো জ্বলে চালার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায়। দুপাশে দুটো আলো জ্বলে। সামনে আর একটা। কোণের দিকে ছোট্ট একটা টেবলফ্যান বেশ আওয়াজ করে ঘোরে। আওয়াজ মাঝে মাঝে এত বাড়ে যে ওর সঙ্গে কথা বলতে বেশ চেঁচাতে হয়।

ফ্যানটা এখনও ঘুরছে; তবে শব্দটায় তেমন জোর নেই। কিন্তু, বৃষ্টির শব্দ প্রখর। সঙ্গে হাওয়ার হুহু। চারিদিকে তাকিয়ে আমি জগদীশকে খুঁজলাম। কিন্তু, কোথাও দেখলাম না। এমনকী পেছনের দিকেও তাকালাম একবার। অবশ্য এর পেছনে কোনও যুক্তি ছিল

না। দুঃখ বোধ হল আমার। কেউ যদি বলেন, এ অবস্থায় ভয় বা বিস্ময় বোধ হওয়াই তো উচিত; দুঃখবোধ কেন? একথার উত্তর আমি দিতে পারব না। সম্ভবত এই বৃষ্টির ভুবনে নিঃসঙ্গ একটি দোকান, এই-ই বোধ হয় দুঃখের কারণ। তবে, এটুকু আমার কল্পনা। আমি নিজেও যে সুনিশ্চিত তা নয়।

আমার নিজের দিকে আমি তাকালাম। দেখতে চাইলাম। যতটুকু যা দেখা যায় দেখলাম বলেই মনে হল। আমার নিজের সঙ্গে দোকানটির একটা সামঞ্জস্য দেখতে পেলাম। আমারও এরকম ঝাঁপখোলা। কিন্তু, এর মধ্যে আমি যে কোথায় তা আমিও জানি না। পার্থক্য এটুকু যে আমি ক্রেতা মাত্র।

আমার যে একটা সিগারেট দরকার। দরকার এজন্যে যে এই পরিবেশের মধ্যে নিজেকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। একটা সিগারেট টানতে পারলে সুনিশ্চিতভাবেই একটু সামাল দিতে পারতাম। কিন্তু, আমার নাগালের মধ্যে থাকলেও আমি হাত দিয়ে নিজে সিগারেটটা নিতে পারছি না। এবং এই বাধার ব্যাপারটা আমার জানা থাকলেও এর স্বরূপ আমি জানি না।

মাঝে মাঝেই আমি আজকাল নিজেকে ছাড়িয়ে যাই। আজকের এই পরিবেশে ঘর থেকে বেরিয়ে আসাও এই জাতীয় একটি ভূমিকা। আমি নিজেই হাত বাড়িয়ে আমার প্রিয় ব্র্যাণ্ডের প্যাকেটটি ছুঁই।

কিন্তু, কী যেন একটা দংশন টের পাই। ঝনঝন করে ওঠে।

মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে আসি। চোখের সামনে হাতখানা মেলে ধরি। দংশনের স্থানে দেখি একটি মৌমাছি।

ডান হাত এগিয়ে দিয়েছিলাম। বাঁ-হাত দিয়ে মৌমাছিটাকে সরাতে গিয়ে দেখি, আমার হাতে আরও আরও সব মৌমাছিরা এসে বসেছে। এরা কেউ দংশাচ্ছে না। বসেছে মাত্র।

এ এক অভাবনীয় দৃশ্যই বটে। আমি ভাবি, চাক বাঁধবে না তো!

চাক বাঁধলে কি খুশি হই আমি?

কিন্তু, অন্য মৌমাছিগুলি উড়ে গেল। একটিই দংশন করল, অন্য কেউ নয়।সাপেরও শুনেছি এই নিয়ম— দুটো সাপ একত্রে থাকলেও একজনের বেশি দংশন করে না।

'তুমি এখানে কী করছ?'

বহুক্ষণের মধ্যে এই প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি— আমার স্ত্রী। আমি তো বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছি, তাহলে!

যাক গে, সব কিছু বুঝি?

আমি বলি, 'একটা সিগারেট কিনতে—'

'এই রাত্তিরে সিগারেট কিনতে? এখন কোনও দোকান খোলা থাকে?'

'এই তো খোলা রয়েছে।'

'তোমার মুণ্ডু! কোথায় খোলা!'

দুজনের দেখার মধ্যে এই পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক চলে না। বিশেষ করে এই রাত্রি, তাতে বৃষ্টিপাত। আমি বললাম, 'খোলা নেই নাকি?'

একথার উত্তর না নিয়ে সে তার ডান হাতখানি বাড়িয়ে ধরল। এমনটা সচরাচর ঘটে না! ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর থেকে আমরা হাতে হাত রেখেছি, এমন হয়নি। ফলে, ব্যাপারটি আমার কাছে দুর্লভ মনে হল। আনন্দে আমিও হাত বাড়িয়ে দেবার আগে আমার সন্দেহ হল, এখনও কি অবশিষ্টে কিছু জমা হয়ে আছে!

'সিগারেট নিলে না?'

'কী করে নেব?'

'খুব ভালো হল, এবার তুমি সিগারেট ছাড়তে পারলে।'

'ছাড়লাম নাকি?'

'বোধ হয়।'

বাড়ি ফিরে এলাম। সুস্বাদুভাবে ফিরে এলাম। আমরা দু ঘরে যে যার বিছানায় গিয়ে শুলাম। ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরদিন সকালে টেবলে একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'আমাদের একটা যে গ্রামোফোন ছিল, কোথায় সেটা?'

'ক-বে নষ্ট হয়ে গেছে!'

'রেকর্ডগুলো?'

'ফেটে বেঁকে ছিল, ফেলে দিয়েছি।'

'মণি কলেজ গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'জয়ন্ত খেলতে গেল না?'

'পায়ে লেগেছে, যাবে না আজ।'

'বাজারে যেতে হবে তো?'

'কী রোদ্দুর।'

'এ বছর কালবোশেখি হল না।'

'কল্পনাদির আজ কাজ।'

'একবার যেয়ো।'

'তুমি?'

'আমাকে বাদ দাও।'

সংসার নিয়ম মতো চলতে থাকে।

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

কর্মক্ষেত্র

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত
সব সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে
সারা ভারতে পাঠকসংখ্যায় ১ নম্বর*

ভ্রমণ

ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*

কালের কষ্টিপাথর

নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

****

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

****

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন

নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

*তথ্যসূত্র: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4

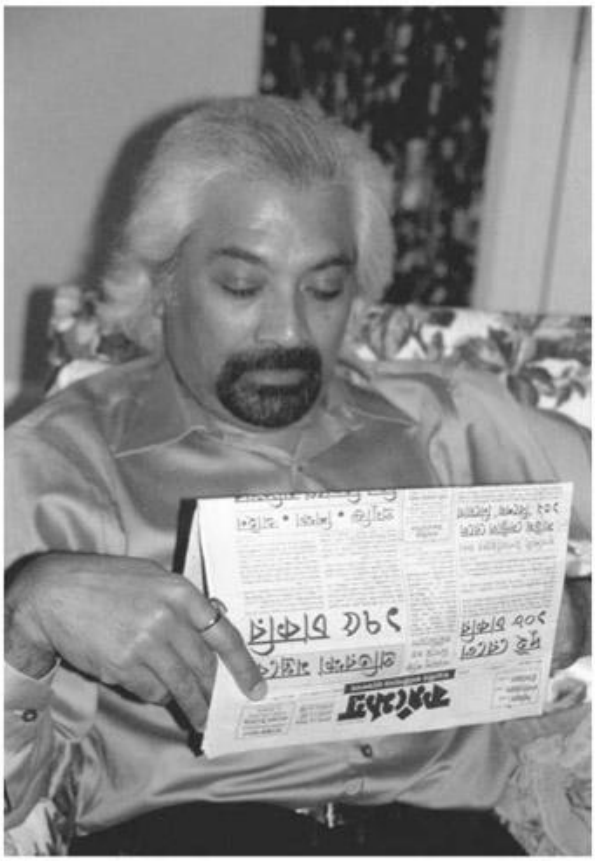

“একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি ‘কর্মক্ষেত্র’-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।”

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ‘রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল’ কর্মসূচির উপদেষ্টা।

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে ‘কর্মক্ষেত্র’-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে **কর্মক্ষেত্র**: www.ekarmakshetra.com

১৩

কলেজ রো'য় নিজের বাড়ি হয়ে গেছে। বহু মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। আমি নিজস্ব ঠিকানায় আয়কর দেওয়া নাগরিকে পরিণত হলাম। নিজের বাড়ির এক তলার গ্যালারিতে ২৭টি সাদা-কালো মাঝারি মাপের ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। ম্যাক্সমুলার থেকে পার্টিশন এনে এমনভাবে সাজানো হল যেন আধুনিকতম একটি চিত্রশালা। মধ্যবিত্ত জনপদ, গৃহস্থ মানুষের আনাগোনার গলি, কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ফেরিওলার ডাক, অসংখ্য বইয়ের দোকান। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কোলাহলমুখর এই এলাকা। গলির ভিতর থেকে গলি বেয়ে এক ওয়েসিসের মতো সংযোজিত হল আমার এই প্রাসাদ— তায় চিত্রশালা। নানা ধরনের সংগ্রহকারীরা আসেন দেশ-বিদেশ থেকে। বহু বিখ্যাত মানুষের আনাগোনায় আমার কলেজ রোর বাড়ি সরগরম হয়ে থাকে। কখনও কখনও সেই সরু গলির বাসিন্দাদের অসুবিধার কারণ হতাম আমি। এই বাজার এলাকায়, ঐতিহাসিক এই সরু গলিতে অসংখ্য বইয়ের দোকান, অতি

"শিপ্রাকে আর এগোতে হয় না। গাড়ি হুস করে আমাকে নিয়ে চলে যায়। পিছনদিকে বিদায় জানাবার কাউকে দেখিনি। সে রাতে আমায় আটকে রাখে থানার অফিসঘরে। ক্ষুধার্ত জেনে বিস্কুট, জল আর ওসির ফ্রিজ থেকে দুটো ঠান্ডা রসগোল্লা যুক্ত হয়। আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি দেখি না। কিন্তু আমি বন্দি। সেটা সেপ্টেম্বর মাস। কলকাতায় প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। পরদিন থানার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। এ-এক অন্য জগৎ। সবাই ভালো ব্যবহার করছেন। সকলেই যেন কিছু বুঝছেন অথচ কিছু করতে পারছেন না। পরদিন অক্লান্ত বর্ষণে কলকাতা ভেসে গেছে। সেদিন ঠিক সন্ধে ছটায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের হাওড়ার বড় ঘড়ির নীচে অপেক্ষা করার কথা। তাদের নিয়ে পুরীতে যাব। যেমন আমরা সময় সময় পাড়ি দিই ছবি আঁকার উদ্দেশে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এবারের আকর্ষণ ছিলেন গুন্টার গ্রাস। তিনি অপেক্ষা করে ট্রেন ধরে ফেলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা তখনও সংবাদ পায়নি। সময় অতিক্রান্ত হলে তবে তারা জানতে পারে।"

১৯৭৮। শিল্পী অহিভূষণ মালিক ও ভবেশ সান্যালের সঙ্গে আমি ও কলেজ অব ভিশ্যুয়াল আর্টস-এর ছাত্রছাত্রীরা

বিখ্যাত লেখক-লেখিকা। বই ক্রেতা-বিক্রেতায় জমজমাট সে পাড়ার যাত্রাভঙ্গ হত। ঢুকে-পড়া কোনও দুর্লভ মহাযানের উপস্থিতিতে। কখনও কোনও দেশের রাষ্ট্রদূত কিংবা কোনও বিদেশের ধনী, দেশি শিল্পপতি থেকে শুরু করে বহু বিখ্যাত মানুষ চলে আসতেন আমার এই ছোট্ট আবাসে। এক ইংরেজ বন্ধু অ্যান্ড্রু আমার এ বাড়ির নামকরণ করে 'পেইন্টার্স হোম গ্যালারি'। ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে কলকাতায় এসে ওরা যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে, অ্যান্ড্রু আর তাঁর বান্ধবী লোরা। তিনদিনের আশ্রয় চেয়ে থেকে গিয়েছিল দেড় মাস। আর একদিনের কথা মনে আছে। জেনারেল ব্রার এলেন সস্ত্রীক ছবি দেখতে। দুপুর থেকে নানান সামরিক কর্তারা গলির সর্বত্র মহড়া দিল। পাশাপাশি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পড়ল সামরিক রক্ষীরা। আমার বাড়ির ছাদেও বন্দুকধারীরা স্থান করে নিল। তখন বাড়িটা যেন কোনও অতি কুখ্যাত আতঙ্কবাদীর ডেরা। গোটা পাড়া থমথমে হয়ে গেল। কৌতূহলী মানুষেরা কেমন নিথর হয়ে গেলেন। এ পাড়ায় পাশের অ্যাটোর্নির বাড়িতে উত্তমকুমার মাঝে মাঝে আসতেন। হাওয়ায় হাওয়ায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত। রাস্তায়, বাড়ির ছাদে ঢল নামত অসংখ্য ফ্যানদের। সে উচ্ছ্বাস তুলনাহীন। কিন্তু এ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কৌতূহল ছিল, বিস্ময় ছিল। উচ্ছ্বাসের ধরন একদম আলাদা। কয়েকটি গাড়ির কনভয়ের মাঝে একটি কালো থমথমে গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন জেনারেল ব্রার সস্ত্রীক। প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে, ছবি দেখে, সংগ্রহ করেছিলেন। যতদিন তিনি পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ হয়ে কলকাতায় ছিলেন ততদিন তাঁর সঙ্গে আমার বহু কাজে, বহু ঘটনায় যোগাযোগ ছিল।

শৈশব থেকে স্বপ্ন একটাই। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নানা জেদ, দাঁতে দাঁত চেপে কত বিরুদ্ধ ঢেউ অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। কত ব্যর্থতা, কত গ্লানি সহ্য করা। আমি যে অনেক বিষয়ে অকৃতী তা জেনেও স্বপ্নের প্রতি নিষ্ঠা রেখে এগিয়ে গেছি। অনেক সময় স্বপ্নের কারণেই অন্য ফলে ব্যর্থ হয়েছি। যে ফল আমার কাঙ্ক্ষিত সে ফল হয়তো অন্যের কাছে গুরুত্বহীন আবার যে ফল হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছি সে ফল কিন্তু অনেক মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের, সমৃদ্ধির। আমি তা পরিত্যাগ করেছি। বা আমল দিইনি। জীবনের সেই অজানা কাঙ্ক্ষিত পথে একটা ঠিকানা হল, শিল্পের ভাষায় বলা যায় আমার জীবনমূর্তির একটা ভিত্তিবেদি। অসংখ্য কাহিনি এই আবাস নিয়ে। এখানকার আবাসিক হয়ে। শিল্পীজীবন শুরু হল কলেজ রো-কেন্দ্রিক (পেডিসস্টল)। প্রায় সামনাসামনি আমার প্রতিষ্ঠান কলেজ অব ভিশ্যুয়াল আর্টস। সন্ধ্যায় ক্লাস। ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০-৫০ জন যাতায়াত করে। আমি সেই বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত ওখানেই থাকি। মন দিয়ে কাজ শেখাই, ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালোবাসে। তারা আমার বন্ধু, সহকর্মী, ভাই, বোন। অনেক সময় সব সম্পর্ক ছাপিয়ে বড্ড আপনার। তারও অনেক কারণ আছে। ছবি আঁকার চর্চা বা চিত্রশিল্পী হওয়ার বাসনায় আমি একান্তে টানা শেখার চেষ্টা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা বা মানসিকতা দিয়ে আমি তাদের উৎসাহিত করতাম। শেখানোর পাশাপাশি দিশা দেখাবার একটা পথ রাখতাম। জীবন ও সমাজের চারদিকে যখন শুধুই নেতিবাচক পরিবেশ সেখানে আমি এদের কাছে সবটাই ইতিবাচক অর্থে কাজ করে যেতাম। তাই অনেক সময় আমি তাদের নিকটতম অভিভাবকের চেয়েও অন্তরঙ্গ অভিভাবক হয়ে উঠেছিলাম। এতে ঝুঁকি ছিল। আর অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে বুঝি যে, আমার আন্তরিকতা, আমার একান্ত সংযোগ, পরিশ্রম, এসব সত্ত্বেও আমি যে খুব সেই অর্থে পরিণত ছিলাম তা নয়। যে অর্থে আজও পরিণত হতে পারিনি।

একটা অহংকার আমার ছিলই। সেটা পালিত হত। তাকে অহংকারও বলা যায় আবার আত্মবিশ্বাসও বলা যায়। সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করে আমি এগিয়ে যেতাম খানিকটা বুনো বরাহের মতো। আমার গতিতে বাধা পেলে সংঘাত তো বাধত। অনেক প্রাণের সঙ্গ নিয়ে কাজের একটা অহংকার আমার ছিলই। সেটা চলত। অনেক প্রাণের সঙ্গে কাজ করতে গেলে প্রাণের ভিন্নতা নিয়ে কোরাস রচনা করা কঠিন কাজ। হয়তো মনে করছি আমি প্রত্যেকের সুর এক করতে পেরেছি। ঐকতান জমে উঠেছে। শুনতে ঠিকই লাগছে কিন্তু এতজনের সঙ্গে দু-একটি বেসুরো, দু-একটি ছন্দহীন, দু-একটি উল্টোসুরে প্রাণ কি থাকবে না? আপাত ঐকতান সুরের মনে হলেও আমি তো ধরতে পারতাম একজন পরিচালক হিসেবে। তাতেই আমার মানসিক অস্বস্তি কখনও কখনও যন্ত্রণায় পরিণত হত। তার থেকে ঘটত কিছু বিপর্যয়।

যখনই আমি কিছু করতে গেছি, যখনই

১৯৯৩। কলেজ রো'র স্টুডিওতে চাঁদের হাট। বাঁদিক থেকে শিল্পী পরিতোষ সেন, শ্রীমতী সেন, অশোক মিত্র, ভবেশ সান্যাল ও চিন্তামণি কর।

সফলতার কিছু কুঁড়ি ধরেছে, হয়তো ফুটে ওঠেনি, হয়তো সুগন্ধ উৎসারিত হয়নি— পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে কিছু বুনো গাছ। তারা কাঁটা নিয়ে এগিয়ে এসেছে আমার মনরসে সিঞ্চন করা লালিত সেই পুষ্প চারাটিকে আঘাত দিতে। অথচ আমার ঘুম নেই সেই কুঁড়িটির পূর্ণ প্রস্ফুটনের আকাঙ্ক্ষায়।

প্রতি বছর সাড়ম্বরে আয়োজন করি বার্ষিক প্রদর্শনী। তখন আমার প্রধান উপদেষ্টা, মানসিক শক্তি জোগানোর অন্যতম মানুষ ছিলেন ভবেশ সান্যাল। আমি ছোটখাটো সমস্ত বিষয় তাঁকে জানাতাম। দিল্লি থেকে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসত পোস্টকার্ড কিংবা ইনল্যান্ড লেটারে। তখন তাঁর বয়স আশি ছুঁইছুঁই। আমার সঙ্গে প্রায় ৫০ বছরের তফাত। কিন্তু সম্পর্ক অনুজের মতো, বন্ধুর মতো। দিল্লিতে গিয়ে ওঁর কাছে উঠি। একজন ব্যতিক্রমী বাঙালি। নিজামুদ্দিনে কী সুন্দর সাজানো গোছানো তাঁর বাড়ি আর স্টুডিও। অসাধারণ সুন্দরী, ইংরেজির অধ্যাপিকা, লাহোরের মেয়ে, পাঞ্জাবি স্ত্রী। আর কন্যা আম্বা প্রায় আমাদের বয়সি। অত্যন্ত পরিচিত, দক্ষ, স্বাধীনচেতা, সুন্দরী শিল্পী। একদিকে অদ্ভুত রোমান্টিক জীবন, আর অন্যদিকে অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক বিরল চরিত্রের পশ্চিমবঙ্গীয় বারেন্দ্র ছিলেন ভবেশ সান্যাল। ওঁর সঙ্গে আলাপ আমার শিল্পীজীবনের গোড়া থেকেই। কিন্তু সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা সেই ৭২ সাল থেকে। ভারতবর্ষে সমকালীন চিত্রকলা বা ললিতকলা অ্যাকাডেমির সূচনা থেকে তিনি প্রধান পুরুষ। একেবারে প্রথম দিককার যাঁরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং যাঁরা প্রশাসনের প্রধান, যেমন পণ্ডিত নেহরু থেকে শুরু করে আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতাদের তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। গঙ্গাপারের শ্রীরামপুর থেকে সরকারি আর্ট কলেজ, সেখান থেকে ডিব্রুগড়, অসম। সেখান থেকে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে লালা লাজপত রায়ের মূর্তি গড়ার অজুরা নিয়ে লাহোরে প্রতিষ্ঠা। লাহোর তখন অবিভক্ত উত্তর ভারতে সংস্কৃতির রাজধানী। প্রকৃতি ও নারীরা অসম্ভব সুন্দর। ভবেশবাবু থেকে যান সেই মহলে। ঋজু, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সেই যুবক-শিল্পী লাহোরের অভিজাত মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া। আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। মেঠো সুরে বাঁশি বাজিয়ে তিনি মোহিত হতেন, মোহিত করতেন লাহোরের অপ্সরাদের। যাঁরা শুধু অঙ্গে নয়, সংস্কৃতি, রুচি ও শিক্ষায় সুন্দরী ছিলেন। তাঁদেরই একজন তাঁর চিরজীবনের সঙ্গিনী হন। সেই ভবেশ সান্যাল দিল্লিতে ফিরে আসেন বিভাজিত ভারতবর্ষের সেই ভয়ংকর দিনে একটি ট্রেনে চেপে। যে ট্রেনগুলির অধিকাংশই ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ, জীবিত-মৃত একাকার আর রক্তের হোলিমাখা উপচে-পড়া। বিভাজিত ভারতবর্ষের বলি। সেইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব ভারত থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে জীবনপরিক্রমার পর দেশের পরিবর্তিত ভূগোল ও রাজনীতির দিনকালে, স্বাধীনতার ইতিহাসলগ্নে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন ভবেশ সান্যাল। শুধু প্রকৃতিই তাঁকে রোমান্টিক করেনি, ইতিহাসের ঘটনাগুলিও তাঁকে রোমান্টিক করেছিল।

শিল্পজীবনের গোড়া থেকে তাঁর নাম জানলেও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। উনি দিল্লিতে থাকতেন আর উপরমহলে ছিল বিচরণ। ললিতকলা অ্যাকাডেমি পত্তনের সময় থেকে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিযুক্ত হন। তারও আগে দিল্লি পলিটেকনিক যা পরবর্তীকালে আর্ট কলেজ নামে পরিচিত হয়েছিল, তার অধ্যক্ষ পদে যুক্ত হয়েছিলেন। উনি একে একে প্রতিভাবান শিল্পীদের বেছে দিল্লি আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত করেন। শৈলজ মুখার্জি, সোমনাথ হোড় থেকে শুরু করে ধনরাজ ভগৎ প্রমুখ ভারতবর্ষের পুরোধা শিল্পীরা দিল্লির আর্ট কলেজকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। সেই সময়টা জুড়ে নতুন ভারত গড়ার উন্মাদনা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, মন্ত্রিসভার সদস্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়— এক অন্যরকম আবহাওয়া। সেই সময়ই

ভবেশবাবুরা উঠে গেলেন দোতলায়। যেন কতকাল ধরে এই পরিচিত সিঁড়িতে যাতায়াত। কাঁসার থালা, কলসি, গোল থাম, ঘোমটা দেওয়া কোনও মহিলার ছবি তায় সিঁদুর টিপ লাগানো। কোথায় যেন যুগ, সভ্যতা থমকে আছে জাদুঘরের মতো।

ললিতকলা। সঙ্গীত, নাটক আর সাহিত্য— এই তিন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রভবন। বিখ্যাত স্থপতি রাহমানের স্থাপত্যশৈলী দিয়ে। নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী— এঁদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা আর বোধ ছিল। সেই সুবাদেই ভবেশ সান্যাল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি, পরবর্তীকালে প্রদোষ দাশগুপ্ত, শঙ্খ চৌধুরির মতো বাঙালি শিল্পীদের কদর হয়েছিল। নেহরু ও পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ভারতবর্ষের ললিতকলা, কারুকলা, লোকশিল্প যা ভারতবর্ষের একটা বিশেষ পরিচয় বহন করে, তার প্রসার শুরু হয়েছে। ভবেশ সান্যাল এসব মানুষদের খুব নিকট ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব খুব মানানসই হয়েছিল এসব দায়িত্বে। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি সে সময় শিল্পের দূত হয়ে। ভারতবর্ষের অসংখ্য তরুণ শিল্পী নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল এই ব্যবস্থায়। আমার সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা, তখন তিনি প্রায় অবসরে। শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বের ভারে উজ্জ্বল এবং সম্মানিত শিল্পী হিসেবে। যখনই ছবি নিয়ে কখনও দলগতভাবে কখনও একক প্রয়াসে গেছি, তখনই তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু সময় কেটেছে। তিনি আমাদের কোনও প্রদর্শনী বাদ রাখতেন না। আমিও তাঁর বাড়ি যেতাম। মিসেস সান্যাল কতবার রান্না করে খাইয়েছেন। নিজামুদ্দিনে তাঁর মনোরম বাড়ি। দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। পরবর্তীকালে নানা সময়ে কলকাতায় এলে আমার ছোট্ট ঘরে, বাড়িতে থেকেছেন। আমিও ওঁর জন্য ওঁর পরিচিত মানুষদের ডেকে মিলনসন্ধ্যার আয়োজন করেছি। কত চিঠি লিখতেন আমায়। একসময় প্রায় সপ্তাহে দু-তিনটে চিরকুট চলে আসত। সব লেখাতেই রস-যুক্ত থাকত। আমার মনে আছে ওঁর বাংলায় লেখা আত্মজীবনী প্রকাশের ইচ্ছের কথা। কী রহস্যময় কারণে 'দেশ' পত্রিকা পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়েছিল বহুকাল। সেখান থেকে উদ্ধার করে আমি শ্যামল গাঙ্গুলির হাতে তুলে দিই। শ্যামলদা তখন 'অমৃত' সম্পাদক। খুব উত্তেজিত হয়ে পাণ্ডুলিপিটি নেন। কিন্তু তিনিও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেননি। ছেপে বেরিয়েছিল পুজো সংখ্যায় কাটছাঁট করে। ময়না তদন্তের চেহারায়। সে-সময় তাঁর একটি পূর্বাপর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম কলকাতায় বিড়লা আকাদেমিতে। সেখানে ভবেশবাবুর বিখ্যাত ছবি ও ভাস্কর্যগুলি সাজানো হয়েছিল। 'লাস্ট মুঘল' ছবিটি দেখে তাঁর রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পিছনে তাঁর পরামর্শ, তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে চলতাম। উনি কখনও পোস্টকার্ডে বা ইনল্যান্ড লেটারে আমাকে নানান নির্দেশ পাঠাতেন। সে সময় আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনভাবনায় যে কয়েকজন মানুষকে সদাসর্বদা স্মরণ করতে হত, তাঁরা হলেন ভবেশ সান্যাল, শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অহিভূষণ মালিক— মূলত এঁরা।

মানুষ যতই প্রবাসে থাকুক না কেন কোথায় যেন আপন ভূমির প্রতি একটা ভয়ংকর আকর্ষণ থেকেই যায়। তারুণ্য-যৌবন এমনকী প্রৌঢ়ত্ব অনেক সময় কাজে মেতে থাকা জীবনকে এসব ভাবার পরিসর দেয় না। বার্ধক্যে কিছুটা, অবসরে ভীষণভাবে টানে পিতৃভূমি, নিজভাষা, স্বসংস্কৃতি সে যাই হোক না কেন। সে সময় উনি অবসরে, আশির ঘর পেরিয়েছেন। আমরা যেন আত্মীয়-আত্মজ অনুভব করতাম পরস্পরকে। তিনি আমার ছোটখাটো আব্দার রাখার চেষ্টা করতেন, আমিও তাঁর। তার মধ্যে দু'টি উল্লেখ করা বোধহয় মানুষটিকে চেনার উপযুক্ত উদাহরণ হবে। প্রায়ই অভিমান করে বলতেন, বাংলা, কলকাতা আমাকে তো কিছুই স্বীকৃতি দিল না। শুভা, তুমি দেখো না, কোনও তামা-টামা জোটে কিনা। এ সমাজে কাকে আর কে দেখে। খুব গুটিকয়েক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী যাঁরা, তাঁরা সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন। অন্তত তাঁর সেই কাজ ভবিষ্যত স্মরণ রাখবে। কিন্তু এ কাজ তো সকলে পারেননি। আমি ভবেশবাবুর জন্য চেষ্টা করেছিলাম। জায়গামতো বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম। সে সময়ের সরকার তাঁর বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করেছিল আর তাঁকে পুরস্কৃত করেছিল তাম্রফলকে। আরেকবার আবদার করেছিলেন। সেই কিশোর বয়সে ছেড়ে যাওয়া তাঁর আদি নিবাস শ্রীরামপুর, তিনি হয়তো একবার বহু বছর আগে গিয়েছিলেন সেখানে। আর কলকাতায় কার্য উপলক্ষে এলে কেউ কেউ দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা তাঁকে স্মৃতিসঙ্গ দিত, এটুকুই। কিন্তু মিসেস সান্যাল কোনওদিন ওই পৈতৃক ভিটা দেখেননি। গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠা বারেন্দ্রগোষ্ঠীর আবাস। আম্বা তাঁদের একমাত্র কন্যা। পৃথিবীর কত দেশ দেখেছে। কিন্তু পিতার জন্মভূমি, জন্মভিটা দেখেনি। ভবেশবাবু ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন, শুভা তুমি পারবে এইসব আয়োজন করতে। এসেছিলেন তাঁরা এই উদ্দেশ্যে। মা-মেয়ে বাংলায় স্বচ্ছন্দ ছিল না। তবু মিসেস সান্যাল কিছু কিছু শব্দে কাজ চালিয়ে নিতেন। আম্বার সে সুযোগ ঘটেনি। অথচ, ফরাসিতে তুখোড়, ইংরেজিতে তো বটেই আর ভারতীয় ভাষার তিন-চারটিতে অনর্গল অভ্যস্ত। আমি আয়োজন করেছিলাম। সেবার তাঁরা আমাদের বাড়িতে আতিথ্য নিলেন। একটি গাড়ি ভাড়া করে ভোরবেলা পাড়ি দিলেন পিতৃউৎস সন্ধানে। শ্রীরামপুর কলকাতার থেকে প্রাচীন জনপদ। গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠা। সেখানে যুগ বদল হয়নি, জনপদ বদল হয়নি। প্রাচীনত্বের সব ছাপই স্পষ্ট। খুঁজে খুঁজে অলিগলি পেরিয়ে সেই সান্যালবাড়ি উদ্ধার করি। কমপক্ষে দুশো বছরের সেসব স্মৃতি। ওটিও ওই এলাকার প্রাচীনতম গৃহ। রাস্তার উচ্চতা থেকে বাড়ি অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। প্রায়ান্ধকার ঘর। একজন সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। খালি গা। পরনে ধুতি। লাঠি হাতে। সেই গৃহে প্রবেশ করেই আম্বার শরীরে যেন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মাটিতে বসে পড়ল। প্রণাম করল সেই বৃদ্ধকে। ভবেশবাবুরা উঠে গেলেন দোতলায়। যেন কতকাল ধরে এই পরিচিত সিঁড়িতে যাতায়াত। কাঁসার থালা, কলসি, গোল থাম,

১৯৭৮। দিল্লির শ্রীধরণী গ্যালারিতে কবি-সমালোচক কেশব মালিকের সঙ্গে আমি ও অন্যান্যরা।

খুব অল্পদিনের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠান তরুণদের মধ্যে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এটাই বোধহয় কিছু স্বজন ও সম-পেশার মানুষজনদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় নানা কারণে আমারও কিছু জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। এগুলো আরও গাত্রদাহের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কারণ হয়ে উঠেছিল এই অহেতুক শত্রুতার। তা চরম আকার নিল একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ঘোমটা দেওয়া কোনও মহিলার ছবি তায় সিঁদুর টিপ লাগানো। ইনি ভবেশবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হয়তো ভবেশবাবুর কাকিমা। কোথায় যেন যুগ, সভ্যতা থমকে আছে জাদুঘরের মতো। সেই বৃদ্ধ আত্মীয় বাটিভর্তি রসগোল্লা নিয়ে এলেন। আম্বা গপগপ খেয়ে ফেলল। যেন বহুকালের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ পেয়েছে প্রাপ্যের মতো। পরনে জিনস, পাঞ্জাবি। সুন্দরী যুবতী আম্বা দিল্লির সেই বহুজাতিক সমাজে যাপিত জীবন ভুলে গেছে। শিকড়ের টান, শিকড়ের অনুভব, শিকড়ের জাদু এমনই। কী খুশি হয়েছিলেন ভবেশবাবু। আরও খুশি হয়েছিলেন মিসেস সান্যাল। কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে গঙ্গার পাড় ধরে, জিটি রোড ধরে ফিরে আসি কলকাতার মিশ্রিত কোলাহলে। সেদিনটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, এই অনাবিল আনন্দের আমিও অংশীদার ছিলাম। তাঁকে নিয়ে আমার স্মৃতি অনেক। মনে হয় এই পর্যন্তই থাক, এসবই ১৯৭৭-৮০র সময়ে।

একেবারে শেষের দিকে এক-দু'বছর হবে তাঁর সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল, কিন্তু উনি খোঁজখবর নিতেন। সেটা আমি পরোক্ষভাবে জানতে পারতাম। প্রথমত, পোস্টকার্ডে হাতে লেখার চিঠির আদানপ্রদান কমে গিয়েছিল। তখন তিনি শতবর্ষ অতিক্রান্ত। মিসেস সান্যাল প্রায় সম্পূর্ণ বধির অবস্থা। উনি কিছুটা কন্যা আম্বার দেখাশোনায় প্রায় গৃহবন্দি শয্যাশায়ী কিছুদিন। তারপরে চলে গেলেন। ভারতবর্ষে ললিতকলার ইতিহাসে একজন ঋজু, সুদেহী, রোমান্টিক, রসিক, ভাস্কর ও চিত্রী সর্বোপরি এক রঙিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ চলে গেলেন। যেন এক যুগের অবসান হল।

আমি নানান বিদেশি আমন্ত্রণে সফরের সুযোগ পাই, সেখানে গিয়ে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলি। তখন আমার কলেজ অব ভিশুয়াল আর্টস, শ্বশুরবাড়ি, শিপ্রা, শিপ্রার বোনেরা সকাল-সন্ধ্যা, নানান তরুণ কবি, সাহিত্যিক, সংগীতকার যাঁরা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের আনাগোনা নিয়ে আমি ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত থাকি। যেসব ছেলেমেয়েরা পাঁচ বছর কাজ শিখে আমার প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আমাকে ছাড়ে না। এদের মধ্যে কাউকে হয়তো কোনও কোনও জায়গায় কর্মসংস্থান করে দিয়েছি। তাদের কৃতিত্বে জীবন শুরু করতে পেরেছে। বেশ চলছে। কিন্তু আমার কর্মকাণ্ড ঘিরে বাইরে একটা চাপা ঈর্ষার গুঞ্জন তৈরি হতে লাগল। সে ঈর্ষার কোনও কারণ বলা খুব মুশকিল। আজও তার রোগ নির্ণয় করতে পারিনি। আমাদের মনুষ্যসমাজ হয়তো এরকমই। আমি পারতপক্ষে কখনও কারও ক্ষতি করার পরিকল্পনা করিনি। রাগ, অভিমান মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেকুরের মতো অস্বস্তি সৃষ্টি করে, সঞ্চারিত হয় না! দৈবকৃপায় তা কোনওদিন দীর্ঘস্থায়ী রোগ হিসেবে শরীরে-মনে দাগ কাটেনি। আজ এই স্মৃতিরেখায় যা কিছু বর্ণনা তা ঈর্ষা, আঘাত, বেদনা, যন্ত্রণা মিলেমিশে শুধুই ঘটনা হয়ে আছে। যেখান থেকে কোনও প্রতিশোধস্পৃহা উঠে আসেনি। আমি সবাইকে স্মরণ করি বন্ধু হিসেবে, অনুজ কিংবা অগ্রজ, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা সম্পর্কিত হিসেবে। খুব অল্পদিনের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠান তরুণদের মধ্যে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এটাই বোধহয় কিছু স্বজন ও সম-পেশার মানুষজনদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় নানা কারণে আমারও কিছু জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। এগুলো আরও গাত্রদাহের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কারণ হয়ে উঠেছিল এই অহেতুক শত্রুতার। তা চরম আকার নিল একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আমার এই ছোট্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখন বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর বহু তরুণ-তরুণী অপেক্ষায় থাকে এই সান্ধ্য শিল্প চর্চালয়ে যুক্ত হওয়ার। আমি আমার মতো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা নিই। শেষমেশ যদি বুঝি যে একান্ত শিক্ষার্থী এবং একাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে

সেই ফরাসিনি আমার ড্রাইভার-ছাত্রটির সওয়ারি হয়েছিলেন। সারাদিন কলকাতা দর্শনের পর চালক আমার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য এনেছিল। সেই একদিনের সাক্ষাৎ তার জীবন পাল্টে দিয়েছিল। সেই ফরাসিনি বিয়ে করেছিলেন সেই ড্রাইভার-ছাত্রটিকে। তার স্থায়ী ঠিকানা হয়েছিল প্যারিস। সে এখন প্যারিসে চিত্রী হিসেবে জীবনযাপন করে।

তখনই যুক্ত করি। কিন্তু ওই বয়সের ছেলেমেয়েরা একদিকে যেমন স্বপ্নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাশাপাশি তাদের উগ্র যৌবনবাসনা চেপে রাখতে পারে না, কখনও কখনও ছাপিয়ে ওঠে, বেপরোয়া হয়ে যায়, হিতাহিত বোধ থাকে না। আমরা তখন সবাই মিলে কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়তাম, কখনও পাহাড়ে কখনও সুদূর সমতলে। প্রকৃতির সামনে শিল্পচর্চার জন্য সেখানে কত ঘটনা ঘটে যায়, ছোটখাটো বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্রের শব্দ আসে, বৃষ্টি ঝরে, মেঘ সঞ্চার হয়, হয়তো প্রলয় হয় না— এভাবে অনেক ছোটখাটো ঝড় গেছে। আমি তার কতটা সামাল দিতে পারি? আমিও তো যুবক। বুঝি, অনুভব করি, কিন্তু দাদা আর শিক্ষক এই দুয়ের পোশাকে মুড়ে রাখি একটু গম্ভীর বয়স্ক অভিনয়ে নিজেকে। তবু অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়। নানা ধরনের পরিবার থেকে, সংস্কৃতির স্তর থেকে জড়ো হয় ছাত্রছাত্রীরা আমার এ প্রতিষ্ঠানে। তাই সমস্যা, জটিলতা জট পাকিয়ে যায়। আমি যতটা পারি সমাধানের চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ কেউ আড়ালে নানান কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। মনে আছে, দু'টি সাক্ষাৎকারের কথা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নামটি দেখে যখন সাক্ষাতের জন্য ডাকি আমি কিছুতেই মেলাতে পারিনি। কারণ নামটি একটি মেয়ের। সে নামে উপস্থিত মানুষটি ছেলে। কৌতূহলে যখন তাকে প্রশ্ন করি, তোমার এই নাম হয় কী করে? ছেলেটি বলে, আমি আমার মাকে খুব ভক্তি করি। তাই তাঁর নামে পরীক্ষা দিলে আমি উত্তীর্ণ হব, এই ভেবে আমি তাঁর নামে পরীক্ষা দিয়েছি। আমি কীই-বা উত্তর দিতে পারি। তার আসল নাম জেনে নিয়ে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করি। পরবর্তীকালে তার একাগ্রতা, নিষ্ঠা, তাকে সঠিক পথে চালিত করেছিল। আর একজনের কথা মনে আছে, সে ছেলেটিও একাধিকবার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ না হওয়ায় একদিন আমার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমার স্বপ্ন আমি ছবি আঁকব। আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে দেন। পরে জেনেছি সে সারাদিন ট্যাক্সি চালিয়ে সন্ধ্যাবেলা ক্লাসে আসে। ক্লাস করে আর নিয়মিত স্কেচ করে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে। বেশ কিছু মাস পরে একদিন এক সন্ধ্যায় সে এক ফরাসি মহিলাকে নিয়ে হাজির হয় আলাপ করাবার জন্য। আমি ক্লাস করার ফাঁকে চলে যাই বাড়ি। স্টুডিও দেখাই, আপ্যায়ন করি। মহিলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে ভারতে আসেন। সেভাবেই কলকাতায় আসা। তাঁর স্বামী প্যারিসে সরবন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। আলাপচারিতা আর আপ্যায়ন-শেষে তিনি চলে যান। কিছুদিন পরে ছাত্রটি বিনয়ের সঙ্গে আমাকে জানায়, তার সুযোগ ঘটেছে প্যারিসে যাওয়ার। আমি খুব আনন্দিত হই। এবং প্যারিসে কী কী মিউজিয়াম দেখা উচিত, কী কী ছবি অবশ্যই দেখা উচিত এসব নিয়ে আলোচনায় মাতি। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত বোধ করে তার এ সুযোগ পাওয়ায়। তখনও আমি তার অন্য প্রেক্ষাপট জানিনি, জানতেও চাইনি। সেই ফরাসিনি আমার ড্রাইভার-ছাত্রটির সওয়ারি হয়েছিলেন। সারাদিন কলকাতা দর্শনের পর চালক আমার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য এনেছিল। সেই একদিনের সাক্ষাৎ তার জীবন পাল্টে দিয়েছিল। সেই ফরাসিনি বিয়ে করেছিলেন সেই ড্রাইভার-ছাত্রটিকে। তার স্থায়ী ঠিকানা হয়েছিল প্যারিস। সে এখন প্যারিসে চিত্রী হিসেবে জীবনযাপন করে এবং শিল্পীদের মূলস্রোতে তার পথ নিশ্চিত করেছে।

আর একটি ঘটনা। ভর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি ছাত্রী। আমরা তার সাক্ষাৎকার নিতে বসেছি। ছোটখাটো চেহারা। অসম্ভব সুন্দর গায়ের রং। বুদ্ধিদীপ্ত অথচ লাজুক। তাদের পারিবারিক অবস্থা, আর কেন ছবি আঁকা শেখা এইসব নিয়ে প্রশ্ন করি। সে সব উত্তর দেয়। এবং প্রসঙ্গত জানায়, তার বাবা গত হয়েছেন সম্প্রতি। বাবার ইচ্ছা ছিল যে সে শিল্পচর্চা করে। কিন্তু বাবার বর্তমানে সে সুযোগ পায়নি। এ কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলে। আমি আর কোনও প্রশ্ন করতে পারিনি। ওই শান্ত, অত্যন্ত মিষ্টি বালিকাটির সেই উত্তর জানার পর তাকে নিয়মিত ক্লাসে আসতে অনুমতি দিই। সেইমতো সে যুক্ত হয়ে যায় আমার সে প্রতিষ্ঠানে।

প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব থাকে। সেই দূরত্ব ভাঙে ক্রমশ ২য়-৩য় বর্ষে এসে। তাই প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত খোঁজখবর খুব একটা আমার কাছে পৌঁছত না। সে সময় কিছুদিন থেকে মেয়েটিকে ঘিরে নানান খবর ইতিউতি কানে আসছিল। একাধিক ছাত্র সেই মেয়েটির দাদা হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি আকর্ষণ করত তার অসহায়তা আর আকর্ষণীয় চেহারায়। অন্যদিকে কিছু কাতর আকর্ষিত সাহায্যকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। এসবকে আমি কীই-বা গুরুত্ব দিতে পারি। বিশেষত আমার কলেজে পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করে নাগালের বাইরে চলে গেছে কিন্তু নিজেরই নাগালের কাছে আসতে চায় ভবিষ্যতের আশা নিয়ে। এর মধ্যে একটি ছেলে বেপরোয়া ছিল। আমি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাঝে মাঝে বসি।

জীবনে একটা পর্ব আসে, যখন বিশেষ করে যেসব সমাজে আর্থসামাজিক পরিকাঠামো খুবই দুর্বল, যৌবনকে যথাযথ ব্যবহারের দিশা থাকে না তখন সামগ্রিক ইচ্ছা, ক্ষুধা, প্রকৃতির তাড়নায় কেন্দ্রীভূত হয় যৌন আকাঙ্ক্ষা, হয়তো ভালোবাসার মোড়কে। কাকে আর দোষ দিই। এসব কিছুই যুক্তি, স্তরবিন্যাস, সময়গত অবস্থান মেনে চলে না। তাই একটা উন্মাদনা বিচারশক্তিকে হারিয়ে দেয়। আর দূর থেকে সেই পরিপ্রেক্ষিত বিচার করি। কাকে দোষী করি— এই ভাবনায়। সেই মেয়েটির এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। হয়তো পুরুষবন্ধুদের আকর্ষণ করার জন্য ও যে অসহায় সেটাকে বেশি করে জানান দিত। অথচ রূপ ছিল।

কলেজ অব ভিশ্যুয়াল আর্টস-এর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। সালটা ১৯৭৯।

আমার কলেজ রোর ক্ষুদে আর্ট কলেজের বারান্দার তলায় ফুটপাথে সন্ধ্যা ছুঁলে একটা জটলা থাকত। প্রায় সকলেই সদ্য পাশ করা ছাত্র। আমি এসব আমল দিতাম না। বরং এসব উপভোগ করতাম। তারা আমার কাছে আসে। আমাকে ঘিরে থাকে। একটি অতি উৎসাহী ছাত্র প্রায় ঢুকে পড়ত ক্লাসে। ক্লাস শেষ হলে সেই মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অছিলায় নিয়ে যেতে দেখতাম। আগেই বলেছি, উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠত একেবারে নবাগতদের সঙ্গে সেরকম হত না। একদিন খুব সকালে মেয়েটি আমার বাড়িতে আসে মাকে সঙ্গে নিয়ে। এবং জানায়, গত রাতে নাকি ছেলেটি বিষ পান করেছে এবং মেয়েটিকে জানিয়েছে যেন সে হাসপাতালে দেখতে যায়। আমার কাছে আগমনের কারণ, আমি এক্ষেত্রে কী পরামর্শ দিই। সেই প্রথম তার মাকে দেখি। মেয়েটির ভর্তি হওয়া, কত মাস ধরে ক্লাস করা, জীবনের কাহিনি শোনা, কিন্তু ওর অন্য কোনও অভিভাবককে আগে কখনও দেখিনি। আমি ছেলেটির এই খ্যাপামোর কারণ জেনে তাকে বলি, অবশ্যই তোমরা যেও। তার মাও ছেলেটিকে চেনেন। সে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করত। শিয়ালদার ওদিকে রেল কলোনির বাসিন্দা ছিল। কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি আমিও। অন্য কোনও খোঁজখবর পাই না দিনভর। সন্ধ্যায় যথারীতি ক্লাস চলাকালীন কয়েকটি ছেলে এক অশুভ সংকেত নিয়ে জানায়, ছেলেটি মারা গেছে। এবং এই নিয়ে নাকি কলকাতার শিল্পীমহলে নানান গুঞ্জন, প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে কিছু শিল্পী-দাদা এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। একটি শিল্পীদলের নেতা ও সমালোচক বিভিন্ন জায়গায় আমার নামে কুৎসা করেছেন— এসব নিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি-পরিবেশ তৈরি হয়েছে কলকাতায়। আমি এ সংবাদ শুনে কিছু ছাত্রদের নিয়ে বাড়িতে বসি। আর ঠিক করি ছেলেটির মা'র কাছে আমরা সমবেদনা জানাতে যাব। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি খুবই বেদনাদায়ক। বিশেষ করে তার খ্যাপামো থাকলেও আমায় খুব শ্রদ্ধা করত। প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করত। অনেক স্বপ্ন দেখত। হয়তো বা ক্ষমতার চেয়ে বেশি, বাস্তবের চেয়ে বেশি। আমি বোঝাতাম। সে সময়ের পরিস্থিতি, আমাকে ঘিরে অসংখ্য ঈর্ষাকাতর মানুষের থাবা। প্রতি পদে পদে চাইত, আমার কর্মকাণ্ড কিছু খর্ব হোক। আমি তাদের শিরঃপীড়া গাত্রদাহের কারণ, আমার স্বপ্নডানা ছেঁটে দিতে তারা জোটবদ্ধ। একদিকে গুন্টার গ্রাস আমার আতিথ্যে রয়েছেন। হইহই করে চলছে আমার পরিকল্পনা। সেই সন্ধ্যার এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমরা যখন আলোচনা করছি, এমন সময় এক পুরনো পরিচিত ভদ্রলোক দরজা ঠেলে ঢুকলেন। এবং জানালেন, শুভা তোমার নামে পুলিশে এফ আই আর হয়েছে। যে-কোনও সময় তুমি গ্রেপ্তার হতে পারো। তুমি একটু সাবধানে থাকো বা অন্য কোথাও চলে যাও। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তার মারা যাওয়ার সঙ্গে আমার এ সমনের কী যোগাযোগ। ছাত্রদের বলি। সেদিনের মতো ক্লাস বন্ধ হয়। আমি কিছু সময় চিন্তা করে ঠিক করি ডিসি নর্থের কাছে খোঁজখবর নেব। কী ঘটনা জানার জন্য। ওরা সকলেই কমবেশি চিনতেন। শিপ্রার সঙ্গে রিকশা চেপে চলে যাই সেখানে। দেখা করি তার সঙ্গে। তিনি আমাকে খুব জানতেন। কিন্তু সে রাতে আমার সঙ্গে খুব একটা ভালো

ব্যবহার করেননি। আমার মন খারাপ হয়। কিছুটা আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হয়। তখন কে আমায় ভরসা দেবে! চলে যাই রিকশা চেপে সে রাতে, আমার সেই ছাত্রীর বাবা উকিল ভদ্রলোকের কাছে। নানা ঝঞ্ঝাটে তাঁর কাছে পরামর্শ পাই। তিনিও আমায় অসম্ভব সাহায্য করেন। কাকে ফৌজদারি বলে, কাকে দেওয়ানি বলে এসবও আমার জানা ছিল না। তিনি জানান, এটা ফৌজদারি বিষয়। উনি অন্য কোনও উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বললেন। আমি ফিরে আসি। বাড়ির কাছে প্রায় অন্ধকার রাস্তায় একটি টিমটিমে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দেখতে পাই, একটি পুলিশের জিপগাড়ি। দু-একজন লোক দাঁড়িয়ে। জানলায় উঁকি মারছে আমাদের পরিচিত কেউ। রিকশা থেকে নামলে কাছে এলেন দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ। আমাকে থানায় যেতে হবে। বড়বাবু ডেকেছেন। তারপর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। অতি ভদ্র, অতি সৌজন্য দেখানোয় আমি বিশ্বাস করি। তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়ি। শিপ্রাকে আর এগোতে হয় না। গাড়ি হুস করে আমাকে নিয়ে চলে যায়। পিছনদিকে বিদায় জানাবার কাউকে দেখিনি। সে রাতে আমায় আটকে রাখে থানার অফিসঘরে। ক্ষুধার্ত জেনে বিস্কুট, জল আর ওসির ফ্রিজ থেকে দুটো ঠান্ডা রসগোল্লা যুক্ত হয়। আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি দেখি না। কিন্তু আমি বন্দি। সেটা সেপ্টেম্বর মাস। কলকাতায় প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। পরদিন থানার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। এ-এক অন্য জগৎ। সবাই ভালো ব্যবহার করছেন। সকলেই যেন কিছু বুঝছেন অথচ কিছু করতে পারছেন না। পরদিন অক্লান্ত বর্ষণে কলকাতা ভেসে গেছে। সেদিন ঠিক সন্ধে ছটায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের হাওড়ার বড় ঘড়ির নীচে অপেক্ষা করার কথা। তাদের নিয়ে পুরীতে যাব। যেমন আমরা সময় সময় পাড়ি দিই ছবি আঁকার উদ্দেশে ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এবারের আকর্ষণ ছিলেন গুন্টার গ্রাস। তিনি অপেক্ষা করে ট্রেন ধরে ফেলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা তখনও সংবাদ পায়নি। সময় অতিক্রান্ত হলে তবে তারা জানতে পারে। পরদিন রবিবার। আমি আছি থানায়। তবে আসামিদের নির্দিষ্ট কক্ষে নয়। এটা নারকেলডাঙা থানা। সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। কিছু ছাত্র শিপ্রার সঙ্গে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে উকিল, কখনও গৌরকিশোর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এঁরা বিচলিত হয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে বেল পাওয়া যায়, মোকদ্দমাটি কোর্টে ওঠে।

কাগজে প্রচারিত হতে থাকল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা বিবরণ। আত্মহত্যাকারী ছেলেটি নাকি চিরকুটে লিখে গেছে, তার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। আমি নাকি অল্প কিছু টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে শোধ দিইনি। এবং সেই কারণে কোনও কিছু প্রমাণ যাচাই না করে আমাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছেলেটির মামা অবিবাহিত। দক্ষ পুলিশ অফিসার। লালবাজারে কর্মরত। তিনি চেয়েছিলেন আমাকে এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে আটক রাখা ইত্যাদি, অথচ কোনওদিন সেই মামাকে আমি চিনতাম না। আর ছিল বেশ কিছু অগ্রজ শিল্পীদের চাপ। যাতে আমার স্বপ্নগুলো ভেস্তে যায়। আমি অকিঞ্চিতকর শঠ হিসেবে বিবেচিত হই।

শিপ্রা আর আমার দু-একজন ছাত্র সেই জলমগ্ন কলকাতায় হাঁটাপথে পৌঁছে যায় ব্যারিস্টার শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তিনি আমার নাম শুনেছেন। ঘটনাটা জেনেছিলেন। রাতে শিপ্রার সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি। রাজি হন পরদিন শিয়ালদা কোর্টে সওয়াল করতে। অকল্পনীয় কষ্ট ভোগ করেছে শিপ্রা। প্রতিদিন কত ধরনের মানুষ এসেছে দেখা করতে। কখনও কখনও পুলিশকে সে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। আমি তো বন্দি। হতাশাগ্রস্ত বন্দি হয়ে দু'দিন কাটিয়েছি টেবিলে-বেঞ্চে শুয়ে-বসে। একদিকে নানা রিলিফের ব্যবস্থা, বস্তা বস্তা চিঁড়ে-গুড়, ভাসমান কলকাতা। চারদিকে দুর্গন্ধ— এক ভয়ংকর নৈরাজ্যের ছবি, অন্যদিকে আমার প্রতিকারহীন দুঃখের যন্ত্রণা। সকালবেলা থানার গাড়ি নিয়ে গেল শিয়ালদা কোর্টে। দোতলার এক কুৎসিত কুঠরিতে ঢুকলাম। সেখানে অসংখ্য কয়েদি। সে ঘর আর পরিবেশের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, নরক দেখিনি, মনে হয় নরক এর চেয়ে ভালো। আমার ডাক পড়ল কিছু পরে। জালঘেরা এক জায়গায় আমাকে উপস্থাপিত করল ওরা। উপস্থিত জজকে অভিযোগের কথা জানানো হল। ব্যারিস্টার ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় আশি ছুঁইছুঁই। প্রবীণ কিন্তু অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন চেহারা। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, রাজ্যে কি বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে? কোন অজুহাতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে? সরকার পক্ষের উকিল কিছুটা বাধা দিতে গেলে ব্যারিস্টার ব্যানার্জি বললেন, যুক্তিহীন কথা বলবেন না। আমার বেল হয়ে গেল। অগণিত ছাত্রছাত্রী আমায় এসেছিল দেখতে। অনেকের চোখে তখন জল। শিপ্রারা তাদের এই সফলতায় খুশি। প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ডে যেখানে আমার পরামর্শ থাকে, একদিন তারা নিজেদের ভাবনায়, পরিশ্রমে এ কাজ করেছে। শিপ্রাদের বোনেরা কদিন অক্লান্ত পরিশ্রম আর আশঙ্কায় কাটিয়েছে। আমি আপাতমুক্ত হলাম। কিন্তু মামলা গড়াল ন'মাস পর্যন্ত। শেষ কালে ছেলেটির মা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এই বলে যে, তার ছেলে তার শিক্ষককে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। আর যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই। নিষ্পত্তির পর কোর্ট থেকে যে বয়ানটা পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল, তদন্ত শেষে জানা গেছে— এ অভিযোগের কোনও ভিত্তিসূত্র পাওয়া যায়নি। তাই এ মামলা খারিজ করা হল। সে খবর কিন্তু মানুষেরা সেভাবে জানতে পারলেন না। অথচ নানা অপবাদে আমি এক ছাত্রহন্তাকারী শিক্ষক হিসেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পরিচিত হয়ে গেলাম। তখনকার কুখ্যাত সাংবাদিক আবদি এসেছিল আমার বাড়িতে। বোম্বের ইলাসট্রেটেড উইকলি চারপাতা জুড়ে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। খুব ছলনা করে অনেক ভালো কথা লিখবে জানিয়ে সব তথ্য নিয়ে একটি অত্যন্ত বিদ্বেষমূলক লেখা লেখে। প্রচারিত হয় এক খলনায়কের কাহিনি। আমার বহুদিনের পরিচিত প্রীতীশ নন্দী বলেছিল, এ এক চরিত্রহননের খেলা। আমার দুঃখ আমার কাছেই থাকে। এই পুরো ঘটনায় আমার কোনও ভূমিকা ছিল না; মানুষ কীভাবে অসময়ে ঘাতকের ভূমিকা নেয় আমি জীবনের প্রতিটা স্তরে বুঝতে পেরেছি। ছেলেটিও আত্মহননের পথ বেছে নেয় সেই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। অন্য কোনও ছাত্রকে মেয়েটি প্রশ্রয় দিত তার চেয়ে বেশি। এই চিরন্তন খেলায় ছেলেটি মনে করেছিল সে হেরে যাচ্ছে। এ পৃথিবীতে দুর্বলচিত্তের, দুর্বল মানসিকতার প্রাণেরা এভাবেই গুরুত্বহীন খেলায় তাদের অমূল্য জীবন পুড়িয়ে দেয়।

ক্রমশ

কালান্তর

সম্পাদকীয়

উপাধি পর্ব

ইংরাজি নববর্ষের সঙ্গে অনেক ঐতিহ্য জড়িত। আমাদের একদা-প্রভু ইংরাজ শুভ বর্ষারম্ভে উপাধি-প্রসাদ বিতরণে ভক্তগণকে পুরস্কৃত করতেন। এই দিনে স্বগৃহে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিবর্গকে, এবং ভারতবর্ষে দেশ-দ্রোহী বা চাটুকারবৃন্দকে তাঁরা উপাধি দ্বারা আপ্যায়িত করতেন। ভারতবর্ষেরও কয়েকজন মুখোজ্জ্বলকারী পুরুষ অবশ্য এইরূপ উপাধি পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। সরকারী এই দাক্ষিণ্য স্বভাবতই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে হ'ত। সে মূল্য কখনও বা দেশের কল্যাণ, কখনও বা অজস্র ভেটের সমারোহ।

জাতীয় সরকার উপাধি বিতরণ রহিত করে দিয়ে অনেক ব্যর্থতায় অশ্রু-সজল এবং অনেক সাফল্যে হাস্য-স্নিগ্ধ এই দিনটিকে বর্ণ-হীন করে তুলেছেন। অনেকের মনস্তাপের কারণও হয়েছেন বোধ করি। যাঁরা চাটুকার্যে পেশাদার, তাঁরা মালিক পরিবর্তনে হতাশ্বাস হবার নন। অকুণ্ঠে পুনরায় প্রাচীন তৈল নূতন যন্ত্রে ব্যবহার করছেন। শুধু পারমিট, লাইসেন্সই নয়, উপাধির দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না, একথা নিশ্চিত বিশ্বাসে বলা যায় না।

বিগত দিনের বিরহে আমাদের কোন শোক নেই। পরন্তু, তখন উপাধি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা দেখেছি, আজ উপাধি বিতরণের জন্য তীব্রতর হুড়োহুড়ি দেখছি। উভয় পর্বই সমান কৌতুকপ্রদ। তখন উপাধি দিতেন সরকার। আজ উপাধি পাচ্ছেন সরকার, দিচ্ছেন বে-সরকারী মহল। ছাত্র-ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কারখানা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, এ পর্বে অগ্রদূত। অগ্রদূত মাত্রই ইতিহাসে স্থান পেয়ে থাকেন। 'কালান্তরে'ও তাঁদের স্থান প্রাপ্য।

আশা করা গেছল, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর, নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অতঃপর ডিগ্রী বিতরণ ব্যাপারে সংযত হবার উপদেশ দেবেন। যে উপাধি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, ডাইজেস্ট পড়ে সংগ্রহ করা যায়, সেগুলি না হোক, উচ্চস্তরের উপাধিগুলির সম্বন্ধে তাঁদের সংযম আশা করা অনুচিত নয়। ডক্টরেট ডিগ্রী এ যাবৎ বহু আয়াসসাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবার দেশপালদের মুক্তহস্তে ডক্টরেট উপাধি বিতরণ করে, স্থিত ডক্টরদের মর্যাদা বোধ হয় বাড়িয়েছেন। কিন্তু দেশ-পালদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমা এতদ্বারা উন্নীত কী পরিমাণ হ'ল বিচার করে দেখা যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সম্পর্ক বিদ্যা এবং জ্ঞানের সঙ্গে। এবারে যে নেতাদের ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হ'ল তাঁরা বিদ্বান এবং জ্ঞানী বলেই তাঁদের সম্মানিত করা হ'ল, এমন কথা ভাবতে পারলে আনন্দিত হতাম। তাঁদের বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের কোনও সংশয় নেই। কিন্তু তাঁদের এই বিদ্যার এবং জ্ঞানের স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এত কাল দেননি কেন? সিকি-শতাব্দীরও অধিক কাল তাঁরা জন-চিত্ত-নায়ক। যখন তাঁরা সৈনিক, তখনই জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁদের আসন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এতকাল কি তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পাননি? গভীর সঙ্কোচের সঙ্গে অনুমান করতে হয় যে পদাধিকার গৌরবই তাঁদের নূতন সম্মান প্রাপ্তির কারণ। অনুরূপ সঙ্কোচের সঙ্গেই স্মরণ করছি যে রবীন্দ্রনাথ ও (তৎকালীন 'বাবু') রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কলিকাতা এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক উপাধি দেবার পূর্বে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন। লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করছি, ভারতবর্ষের কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর করদ রাজ্যের নৃপতিদের নিয়মিত উপাধি বিতরণের কাহিনী।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকে বিচিত্র বিদ্যালয় বলে থাকেন,— সে বোধ করি এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিচিত্র কীর্তি-কলাপ স্মরণ করেই।

দাতার পর গ্রহীতার প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। শুধুমাত্র দানের পুণ্যে দাতার সর্ব পাপ স্খালন হয়। কিন্তু গ্রহীতাকে সমর্থন করব কোন যুক্তিবলে? যাঁরা দেশ-নায়ক তাঁরা সর্বত্র সম্মান-ভূষিত হন, এ আমাদের কাম্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারী খেতাবই শুধু নয়, লৌকিক আরও বহু সম্মান ও সমৃদ্ধি অবলীলায় যাঁরা উপেক্ষা, করছেন তাঁরা হঠাৎ কেন মোহগ্রস্ত হলেন, আমরা বুঝতে অক্ষম। অগণিত জনগণের হৃদয়োৎসারিত শ্রদ্ধার মাল্য অপেক্ষা সিণ্ডিকেট-কোর্ট-পার্টি-শোভিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাগজের ডিপ্লোমা তাঁদের কাছে অধিকতর মূল্যবান মনে হল? নি-খাদ স্বর্ণের অধিকারী, মেকী গিল্টীর মায়ায় প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে চলেছেন।

কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষের দেওয়া নয়, কার দেওয়া তাও আজ অনেকের মনে নেই, তবু 'মহাত্মাজী' 'কবি-গুরু', 'দেশবন্ধু'— এই উপাধিগুলি তো শুধু সংজ্ঞা মাত্র নয়— শ্রদ্ধা-ভাজন সমগ্র মানুষটিকে স্মরণ করিয়ে দেবার সোনার কাঠি। 'পণ্ডিতজী' বলতে হাজারো পণ্ডিতের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত জওহরলালকেই বুঝেছি। বরদৌলির 'সর্দার' আজ সাধারণের মনে ভারতের 'সর্দার' প্যাটেল। 'মৌলানা সাহেব' বললে বুঝিয়ে দিতে হবে মৌলানা আজাদকে এমন মূর্খ আমাদের জানা নেই। তাই যখন দেখি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ হয়েছেন, তখন দুঃখ হয় এই ভেবে যে বহু বিদ্রুপ জর্জরিত 'বাবু' শব্দটী যাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নূতন গৌরব অর্জন করেছিল, তিনি বা তাঁর ভক্তগণও উপাধির মোহ কাটাতে পারেননি। যাঁরা অসাধারণ ও বিশেষ তাঁরাও ডক্টরেটের টীকা পরে স্বেচ্ছায় সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসতে চান, এ এক অদ্ভুত পরিহাস। ডাঃ আম্বেদকর এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ অতঃপর সম্মান-সূচক ডক্টরেটের প্রার্থী হলেই এই পরিহাস-চক্র সম্পূর্ণ হবে।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আদালতে হাজিরা দেওয়া থেকে ছাড় পেয়ে বাড়ি ফিরে এলেন আলিপুর সদর মহকুমার এস ডি ও বিমল। স্ত্রী সীমা অসময়ে বিমলকে দেখে অবাক হয়। কিন্তু একটু বিশ্রামের তোড়জোড় করতে না করতেই জেলাশাসকের ফোন। বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে অকাল কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডি এম-এর নির্দেশে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দিলেন বিমল। সঙ্গে দেহরক্ষী বুদ্ধদেব আর ড্রাইভার যোগেশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিমল বুঝলেন, ধর্মের নামে অসম্প্রীতির উস্কানিতে মদত রয়েছে রাজনীতির। সামনেই ভোট। ঝুঁকি না নিয়ে ডি এম-কে জানিয়ে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে দিলেন বিমল। ফিরে এলেন অফিসে। আয়কর রিটার্ন জমা না করায় তাঁর নামে ভিজিল্যান্স দপ্তরের একটি চিঠি এসেছে। আলস্যের কারণে যে কাজ এতদিনেও তাঁর দ্বারা হয়নি, বিল-ক্লার্ক ভবেশবাবুকে ডেকে সেটা দ্রুত করে ফেলার নির্দেশ দিলেন বিমল। তাঁর সম্পত্তি বলতে সীমার সঙ্গে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যাতে হাজার তিনেক টাকা পড়ে আছে। তাঁর চোখ চলে যায় দূরে ডি এম অফিসের প্রাচীন কাঠামোর দিকে। ওখানে রেকর্ড রুমে বন্ধ কত পুরনো দিনের নথি। বিমলের ইচ্ছে একবার ওই ঘরে ঢোকার।

৩

সামনে খোলা জানলা-পথে ডি এম অফিসের ছাদ। লালরঙা সাহেব আমলের বিল্ডিংয়ের আভাস। একেবারে টঙে জলের ট্যাঙ্ক। নীচ থেকে একটা সরু লোহার সিঁড়ি উচ্চে উঠে গেছে। ওখানে এক জোড়া গোলা পায়রা বসে আছে। তারা এধার-ওধার ঘাড় বেঁকাচ্ছে

চকিত ভঙ্গিতে। সেই ভঙ্গিমার ওধার কিংবা পিছন হতে ডি এম অফিসের টঙে জাতীয় পতাকা সামান্য হাওয়ায় দুলছে। পতাকার তিন রঙের সঙ্গে এই দ্বিপ্রহরি আকাশ আর বাদবাকি পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। সবই যে যার মতো দুলছে, খেলছে। শহর কলকাতার ট্রামবাস, মানুষজন যে যার মতো ব্যস্ত আছে। কেউ কারও কথা শুনছে না। ভাবছে না। যে যার মতো নিজের নিজের কাজে মজে আছে। পতাকা তার তিন রং ধারণ করে কী আশ্চর্য উদাসীন হয়ে ওখানে দণ্ড ভর করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে দুপুরের ব্যস্ত ইলেকশন অফিস। বন্ধ দরজার ওধারে লম্বা করিডোর আর ওই দিকের খুপরি ঘরগুলো জুড়ে ব্যস্ততা। ঝপাং ঝপাং ইলেক্টোরাল রোলের বান্ডিলগুলো আছড়ে ফেলা— এ টেবিল থেকে সে টেবিলে। এক পাশে এক খুপরি ঘরে ঠিকে টাকায় নিযুক্ত কম্পিউটার কর্মী রোগা পাতলা যুবক ছেলে দেবাশিস। বহুদূর চন্দননগর থেকে আসে। বেশিরভাগই এক জামাপ্যান্ট। বোঝা যায়— সংসারের ভাবগতিক। ছেলেটি একটু চাপা আর শান্ত স্বভাবের। তবে বুদ্ধিমান।

অনেকটা টেলিপ্যাথির মতো বন্ধ দরজা ঠেলে দেবাশিস তার স্বাভাবিক স্বভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে একটা ফাইল।

বিমল কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে বলে, এসো।

দেবাশিস টেবিলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে হাতের ফাইলটা তার দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর বলে— স্যার, কম্পিউটারে যেসব ছেলেরা কোম্পানির কাজ করছে তাদের বিল আর অ্যাটেন্ডেন্স এখানে আছে। আপনি একটু দেখে দেবেন স্যার।

বিমল গম্ভীর মুখে বলে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলো কেন বলো তো? বসতে পারো না?

— স্যার, ঠিক আছে।

— কিচ্ছু ঠিক নেই। তুমি বোসো।

ছেলেটি বসে। কিন্তু আড়ষ্টভাবে। এভাবে বসা তার স্বভাব নয় এটা বোঝা যায়।

বিমল হঠাৎ বলে ওঠে, ক'টার ট্রেনে আসো?

— স্যার চন্দননগর থেকে সাতটা দশ।

— তারপর হাওড়া। সেখান থেকে আলিপুর।

— অত সকালে খেয়ে আসো?

দেবাশিস মাথা হেলায়।

— অফিসে টিফিন খাও?

এবারেও মাথা হেলায় সে। তারপর বলে, অফিসে তো ইলেকশনের টিফিন-প্যাকেট দেওয়া হয় স্যার।

বিমল বলে, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

— স্যার, আমি, মা আর একটা বোন।

— বাবা?

— নেই। মানে আজ দশ-বারো বছর নিরুদ্দেশ।

— বোন কি পড়ে?

— না স্যার, কম্পিউটার শেখে। পাড়াতেই একটা সেন্টার আছে।

— তোমার বাড়িতে নিজের কম্পিউটার নেই?

— না স্যার। প্র্যাক্টিস তো অফিসেই হয়ে যায়। স্যার ফাইলটা একটু দেখে দেবেন?

— বড়বাবু দেখে দিয়েছেন তো?

— হ্যাঁ স্যার।

দেবাশিস চলে যায়। বিমল দেখে এই বয়সেই ছেলেটা কেমন যেন সামনে নুয়ে পড়া ভাব। কোমরের বেল্ট যথাস্থানে থাকতে চাইছে না। পিছনের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট-লাইটার ঠেলে উঠেছে। এই শরীরে ধোঁয়া ফুঁকলে আর কী বাকি থাকবে!

বিমল টেনে নেয় দেবাশিসের রাখা ফাইলটা। বিল ক্লার্কের নোট এবং সই—

বাঁয়ে। যথারীতি বড়বাবু সই করতে ভুলে গেছেন। নাকি ভিতু মানুষটি এইসব কাগজে সই করতে ভয় পান। টাকাপয়সা পেমেন্টের ব্যাপার তো।

বিমল নোটশীটের বাঁয়ে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে লেখে Head Clerk?

সেল ফোন বেজে ওঠে। বিমল দেখে অপরিচিত নাম্বার। অন করে।

— হ্যাঁ।

ওধার থেকে এক মহিলা কণ্ঠ, নমস্কার স্যার।

— কে বলছেন?

— আমার নাম বিজিতা সেন। আমি যাদবপুর থেকে বলছি।

— কী ব্যাপার বলুন।

— স্যার, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস। মানে প্রশাসকের লোকজন জড়িত।

— কী ব্যাপার শুনি।

— স্যার, যাদবপুর থানার এক অফিসার আমায় রোজ রাতে ফোন করে বিরক্ত করে। আজেবাজে কথা বলে।

— আপনার নাম্বার জানল কী করে?

— তা তো জানি না স্যার। তবে লোকটিকে আমি চিনি। আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোর পারমিশনের ব্যাপারে গতবার আমরা দল বেঁধে থানায় গিয়েছিলাম। ওই লোকটিই এই কাজটা দেখছিল। তখন থেকেই আমায় মার্ক করে রেখেছে।

— অফিসারটির নাম কী?

— স্যার, গৌতম দে।

— আপনি তার নাম কেমন করে জানলেন?

— ওধারে বিজিতা খানিক চুপ। তারপর বলে, স্যার, আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে।

— হুঁ। তা তিনি কী করে জানলেন?

— স্যার, থানায় ওর চেনা একজন কনস্টেবল আছে। ওদের বাড়ির নীচে ভাড়া থাকে।

— বুঝলাম। আপনি পুরো ব্যাপারটা একটা অ্যাপ্লিকেশন করে আমায় জানান।

— আমি কি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

— প্রয়োজন নেই। আপনি সবটা আমায় লিখে জানান। আমি দেখব কী করা যায়।

এবার ওপারে মৃদু হাসি। — দেখবেন তো স্যার?

বিমল এক পল চুপ করে থাকে। তারপর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফোনটা রেখে দেয়।

আজাহার এসে গ্লাসে চা দেয়।

— স্যার, আজ তো টিফিন করলেন না!

অনমনস্ক বিমল কোনও জবাব দেয় না।

আজাহার আবার বলে, স্যার, উড়িয়ার দোকান থেকে কচুরি এনে দেব?

এবারেও কোনও কথা বলে না বিমল। আজাহার খানিক দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। দরজা বন্ধ হওয়ার মৃদু শব্দ হয়।

বিমলের মনে মনে ঘোরে একটু আগে কথা বলা মহিলাটির স্বর। এমন বিপদ, যা স্থানীয় পুলিশের দিক থেকে এগিয়ে এসেছে সে বিষয়ে তার কথা। মেয়েটির কথা প্রথম প্রথম স্পষ্ট ছিল। কিন্তু শেষের দিকে কেমন যেন অকারণে গায়ে পড়া বলে মনে হতে লাগল। দেখা করতে চায়। দেখা করাটাই যেন জরুরি। মূল অভিযোগ তো জানাই হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে বাড়তি দেখা করার কী প্রয়োজন!

বিমল ইন্টারকমে সি এ-কে বলে ও সি যাদবপুরকে ধরে দিতে।

ওদিক থেকে ও সি, নমস্কার স্যার, নমস্কার।

— হ্যাঁ, নমস্কার বড়বাবু। একটা কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপারে আপনাকে ফোন করতে হল।

— বলুন স্যার।

— বিমল সামান্য থেমে বলে, আচ্ছা, আপনার থানায় গৌতম দে বলে কোনও জুনিয়র অফিসার আছেন?

— আছে স্যার। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর। একেবারেই জুনিয়র ছেলে। বনগাঁয় বাড়ি। এটা ওর সেকেন্ড পোস্টিং স্যার।

— বাঃ! বিয়ে থা করেছে কি?

— না স্যার। এই তো সবে নতুন চাকরি।

— হুঁ। তাহলে— তাহলে, ছেলেটি কেমন?

— ভালো ছেলে স্যার, ভালো ছেলে। তবে রাত্রে একটু আধটু ইয়ে করে। তবে রোজ নয়। মাঝে মাঝে।

— সে করুক। ওটা তার নিজের ব্যাপার। তবে পাবলিক কমপ্লেন হলে তো মুশকিল।

ও সি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। কালই আপনার সঙ্গে দেখা করছি। সামনাসামনি কথা বলা যাবে স্যার।

— বেশ তো। তাহলে বিকেলের দিকে — চারটের পর চলে আসুন।

বাড়ি ফেরার পথে বিমল সিকিউরিটিকে দিয়ে উড়িয়ার দোকানের বিখ্যাত কচুরি আর মা-র জন্য রসগোল্লা কিনিয়ে নেয়। বুদ্ধদেব বাড়ি গেছে এক হপ্তার জন্য নিয়মমতো। তার বদলে এসেছে পার্থ গাঙ্গুলি নামে সিকিউরিটি। ঝকঝকে চেহারা। বয়স বুদ্ধদেবের চেয়ে কম। কম কথা কয়। আর দারুণ স্মার্ট।

পার্থ কচুরি পত্র ড্রাইভার যোগেশের পাশে রেখে যথানিয়মে গাড়ির সামনের সিটে বসে পড়ে।

পার্থ কথা বলে, স্যার বাড়ি গিয়ে আর কোথাও বেরোবেন কি?

বিমল বলে, কেন বলুন তো?

— না স্যার। তাহলে নাইট শোয়ে একটু সিনেমায় যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে।

— বেশ যান। তবে মোবাইলটা অন রাখবেন। হঠাৎ দরকার পড়লে— পার্থ মাথা হেলায় বিমল কথা শেষ করার আগেই।

জেলখানার পাশ দিয়ে গাড়ি এসে থামে যখন সন্ধে হয়ে গেছে তার অনেক আগেই। ওপরে এ ডি এম সাহেবের ঘর অন্ধকার। বারান্দায় ওঁর মা— যিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, বসে আছেন। নীচে বাঁয়ে আর এক এ ডি এম-এর ঘরে তাঁর কিশোর পুত্র লাফালাফি করছে। এ ডি এম, ল্যান্ড রিফর্মস জ্ঞানেশ চৌধুরী অনেকক্ষণ ফিরে গেছে— বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

কলিংবেল টিপতে হোমগার্ড ভবতারণবাবু দরজা খুলে দেন। অতি বিনীত, রোগা কিংবা রুগ্‌ণ, মাথায় ঠেসে কলপ করা আর সর্বাঙ্গে বিড়ির ঝাঁজ। ব্রিফকেসটা তার হাতে দিয়ে পার্থ স্যালুট ঠুকে চলে যায়।

ও ঘরে মেয়ে গান গাইছে তার স্বাভাবিক মিঠে গলায়।

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর—
হিজল বিছানো বনপথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো প্রিয়া...।

মুনি তার বাপের লাবণ্যটুকু পেয়েছে, আর স্বভাব মা-র মতো এককাট্টা, অভিমানী আর স্পষ্ট কথা বলা। এবং কলেজে সে

জনপ্রিয়। তার গানের গলা ভারি মিঠে অথচ গমগমে। বাংলা গান শেখার পাশাপাশি সে ক্ল্যাসিক্যালও শেখে কলকাতার এক নামী বাঙালি ওস্তাদের কাছে।

বিমলের মনে আছে তাঁকে ফোন করায় তিনি বললেন, শুনুন, যদি ও আমার শেখানো গান নিতে পারে তাহলেই ওকে আমি নিজে শেখাব। তা না হলে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিখে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

বিমল নিজের চাকরির পরিচয় দেয় না। ওটা বলতে মুখ সরে না। এক কথায় রাজি হয়ে যায়। ওঁর মতো সুপণ্ডিত শিল্পীর কাছে গান শিখতে পারাটাই তো ভাগ্যের কথা। তাছাড়া উনি কলকাতারই এক নামী রিসার্চ সেন্টারে থাকেন। ওখানে বড় বড় গাইয়েরাও থাকেন। যদি মেয়েটা একটু আলো পায়।

ফোনে কথা বলে মুনিকে নিয়ে গেল বিমল এক সকালে তাঁর কাছে। বাগানঘেরা মস্ত এলাকা। ভিতরে দূরে দূরে কোয়ার্টার। সবই একতলা আর বেশ বড়সড়। খোলা বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। চেক লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরনে। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। অদূরে একজন কালো রঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক। দু'জনে কী যেন কথা হচ্ছে।

বিমল জোড়হাত করতে উনি উঠে দাঁড়ান। তারপর মৃদু হেসে বলেন, ভিতরে আসুন।

বারান্দার ও-পাশে ভারি পর্দা টানা বড় ঘরের মেঝেয় গালিচা পাতা। তার রংটা মোলায়েম চন্দনের মতো। দেওয়ালে দাঁড় করানো কয়েকটি তানপুরা। নীচে রাখা তবলা-ডুগি বেশ ক'জোড়া। দেওয়ালে মা সরস্বতীর পাশে সম্ভবত ওঁর গুরুজির ছবি। ঘরে ধূপ জ্বলছে।

মাটিতে বসে উনি মুনিকে বলেন, এখানে বসো।

মুনি দু'পা মুড়ে বসে। তিনি এবার সামনে পেতে রাখা হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে স্কেল বেঁধে বলেন, সরগম বলো-তো দেখি। মানে সা-রে-গা-মা।

মুনি ওঁর মৃদুস্বরে রীড টিপে রাখার পাশে গলা রাখে।

এরপর উনি বলেন, ইমন জানা আছে নিশ্চয়ই।

মুনি মাথা কাত করে।

— বেশ, গাও একটু।

উনি যথারীতি হারমোনিয়ামের রীড টিপে ধরে থাকেন। মুনি গলা রাখে সুরের সঙ্গে। উনি চশমার ও-পারে দু'চোখ বোজেন।

সামান্য কিছুক্ষণ শোনার পর উনি বলেন, থাক। বেশ বিমলবাবু, আপনার মেয়েকে আমিই শেখাব। তবে ওকে আরও ভালো করে রেয়াজ করতে হবে।

বিমল জামাপ্যান্ট ছেড়ে বাইরের বারান্দায় বসেছে। ভবতারণবাবু চা দিয়ে গেছেন। বাইরের আলোটা নেভানো। সামনে প্রকাণ্ড প্রান্তরের ওপারে কতিপয় টালির ঘর, কিছু কলাগাছ, ঝাঁকড়া নারকেল। এধারে উঁচু তালগাছ। গাড়ির বাবু যা আছে সবই বাঁয়ে খাল পেরিয়ে— অনেক দূরে কালীঘাট ব্রিজের দিকে।

মুনি ওঘরে গান গাইছে—

নদীর পারে বন কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যামকিশোর—
আসিবে আজি বন্ধু মোর।

ক্রমশ

অনলাইনে কিনতে ▸www.swarnakshar.in

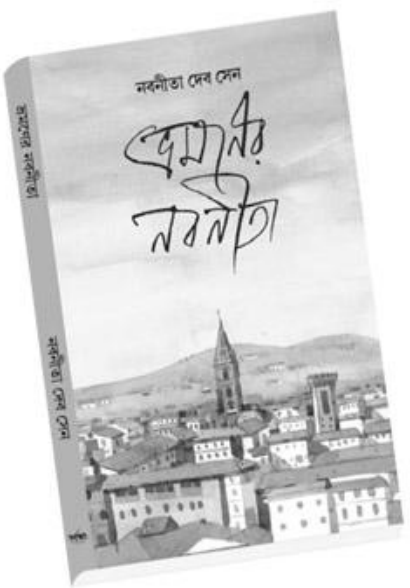

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

কবিতা-পরিচয়

বাসা-বদল: অমিয় চক্রবর্তী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পেয়ালা ও প্লেট:
রাত্রে এসে রান্নাঘরে দাঁড়াই কোনায়, সাক্ষী ওরা
সাক্ষী আমি, মাথা হেঁট—
নিঃশব্দ পসরা
ফিকে সবজি, চেনা চায়না, কতদিন চেনা
চায়ের আসরে কবে হঠাৎ উৎসবে
কারু পাত্রে ভরেছিল আনন্দ প্রহর
আলোর জহর—
নিভৃত সংসার সে কি বুদ্‌বুদের ফেনা
ভাসবে নিয়নে-জ্বলা ম্লান সন্ধ্যাস্রোতে
আরব্ধ ভূমিকা শেষ হতে নাই হতে।

নমস্কার।
নম্র গ্যাস্‌-স্টোভ্‌; সুইচ্‌, বিনীত তৎপর বিজ্‌লি-ধার;
দেয়ালে ঝোলানো সারি কাঁটা-ছুরি; ফ্রিজ্‌,
হল্‌দে, ঠাণ্ডা; পাশে জানলা, বস্টন-কেম্ব্রিজ
পরদার আড়ালে চিত্রবৎ।
ছিল কত ধোয়া আর মাজা
সাবানে গরম জলে; চাম্‌চে, ডেক্‌চি সাজা—
ওদিকে বসার ঘরে বন্ধুর সংগৎ।
পেয়ালা ও প্লেট
কৃতঘ্ন কালের প্রান্তে ভেঙে-যাওয়া সেট্‌—
ভোর হলে
ট্রাক আসবে, সবই নেবে, আমরাও যাব সঙ্গে চলে।।
বস্টন— নর্থ হ্যাম্পটন
আগস্ট ১৯৬৬

আমার সামনে অমিয় চক্রবর্তীর একটি সতেজ, নতুন, অপ্রকাশিত কবিতা; হাতের কাছেই তাঁর চিঠি। সমালোচকের পক্ষে এর চেয়ে পরমতর সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? কিন্তু, রিচার্ডস্‌ যাকে 'availability of the Poet's experience' বলেছেন কবি-অভিজ্ঞতার সেই ঘটনাবলির প্রাপনীয়তা সত্ত্বেও আমাকে একবার থম্‌কে দাঁড়াতে হল। 'কবিতা-পরিচয়ে'র কয়েকটি সংখ্যা থেকে যে-দ্বৈরথের পরিচয় মেলে তার প্রেক্ষিতে আপাতত একটি কবিতাকে পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, নিছক একখানি শিল্পসংঘটন বলে মেনে নিলে নিরাপত্তা বজায় থাকে। এই মর্মে সংকোচের পরক্ষণে মনে হল কবিতা বিষয়ে ওই শিবিরশীর্ণ ধারণাও তো একটা তত্ত্ব। অতএব শুরু করে দেওয়া যাক।

ভাবতে ইচ্ছে করছে আনুষ্ঠানিক কর্মসূত্রে বস্টন-বসতির অবসানে এই কবিতাটির বিভাগ সূচিত। বাইরের দিক থেকে যে-পালা শেষ হয়ে গেল, প্রশ্ন জাগে, তা কি একেবারেই চুকে গেল? গার্হস্থ্য জীবনের সমূহ অনুষঙ্গী অনুপুঙ্খ এই প্রশ্নটিকে শাণিত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কবিতাগুচ্ছ সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী 'daring' আখ্যা প্রয়োগ করেছেন, তার কারণ নিশ্চয়, রবীন্দ্রনাথ ওই পর্বে একধরনের অনাস্থা অথবা অনৃজু ভঙ্গি পোষণ করেছিলেন। 'সানাই' বইয়ের 'অপঘাত' 'পালা-বদল'-এর 'অপঘাত' কবিতায় একই অশান্তির অপর অভিক্ষেপ। বর্তমান কবিতাটিকে 'সানাই'-এর 'বাসা-বদল' কবিতার পাশাপাশি রাখলে অমিয় চক্রবর্তীর অভীপ্সা অনুমান করতে পারব। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি 'যেতেই হবে/দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো/ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা'— এই অর্ধ-অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসে আয়োজিত। ওই আখ্যায়িকার নায়িকা যখন বাসা-বদলের প্রহরে যৌব-স্মৃতি আস্বাদন করছেন, তার বিশ্বস্ত কর্মচারী তাকে সেই সুযোগ দিয়ে 'ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে/হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরুশ/নখ চাঁচবার উখো/সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল/ছেড়ে-ফেলা শাড়িগুলো/নানা দিনের নিমন্ত্রণের/ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।' স্পষ্টতই আঁচ করা যায়, নায়িকার কাছে বাসাবদলের চেয়েও কাঙ্ক্ষণীয় তার স্মৃতিকমনীয় প্রসাধনদ্রব্যগুলি। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সন্নিবেশিত পুঙ্খপুঞ্জ (details) এসেছে নিদারুণ বেদনা থেকে, কোনও শৌখিন হৃদয়রঙ্গ থেকে নয়— এইটেই এখানে প্রধান প্রতিজ্ঞা। পুঙ্খানুপুঙ্খের সমাবেশের আর একটি অভিঘাত অবশ্য কবির জানা ছিল। ভারতীয় ভাবানুষঙ্গে ঋদ্ধ কবি মারিয়ান মূর-প্রসঙ্গে ভারতীয় কবি অমিয় চক্রবর্তী লক্ষ করেছেন:

'one sees a jewelsetter as well as a gemnologist at work when she holds out a handful of in a subtle gesture like this:

Sapphires set with emeralds and pearl with a moonstone, made fine with enamel in gray, yellow, and dragon-fly blue:

a lemon, a
pear

and three bunches of grapes, tied with silver: your dress a magnificent square
Cathedral tower of uniform
at the same time, diverse appearance—a
species of vertical vineyard, rustling in the storm
of conventional opinion...

আরো একটু দূর এগিয়ে অমিয় চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন:

'Caught between didacticism and dadaism, the fading school of symbolists had to hit this kind of mosaic—intricate and challenging- so that life itself could be symbolized.' ('Marianne Moore—Only in Pure Sanskrit', *Marianne Moore 75th Birthday Volume 1964-65)*

'পালা-বদলে' 'শাদা মার্বেলের ছকে ছায়া আঁকে পাতা/আপ্লুত প্রসন্ন বেলা কুসমিত, বনের হরিণ/শাদা-তারা-চমকিত রেশমী বাদামী ত্বক্,/শৃঙ্গভাল, গুচ্ছ-গুচ্ছ লাল ফুল, জলে/রৌপ্যস্বর্ণ মৎস্যাঙ্কন, হরিৎ বিদ্যুৎ/কৌতুকী লাবণ্যবর্ণা সংসারিণী, স্নিগ্ধরতা,/ আত্মমুকুর দেখে, চলে ধূপ পুষ্পবাস,/ রঙিন সজ্জিত জনতার আনাগোনা'— কাংড়া-ছবির প্রসঙ্গবহ হলেও একই প্রবণতার জরিকাজ। কী করে অলংকরণের পরিধি পেরিয়ে গিয়ে প্রতীক বুকের মধ্যে জীবনকে ভরে নিতে পারে, ভারতবর্ষের আধুনিক কবির কাছে সেটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এখানে স্মরণযোগ্য, প্রতীক ব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বদর্শীর বিখ্যাত অনুজ্ঞা: 'ন প্রতীকে ন হি সঃ'— যার সংবৃতার্থ: 'প্রতীকে নিজেকে জানা যায় না; প্রতীক-পূজারির সংসারভাব যায় না'। আলোচ্য কবিতায় পশ্চিম কবিতার কাছ থেকে দীক্ষিত সিম্বল ব্যবহৃত হলেও কবিতাটিকে একান্ত ভারতবর্ষী মানুষের মনে শিকড়িত মায়াভরা সংসারের কান্না (তুলনীয়: 'মৃত্যু চেয়ে কোন প্রাণ জানে বহুগুণ/দুঃখের দাহনে/এত মায়া তবু এই মায়ার ভুবনে'— 'ভাঙা গোড়ালি', ''পালা-বদল''; 'কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল'—''অন্তর্জলী যাত্রা'', কমলকুমার মজুমদার) মূর্ছিত হয়ে আছে। আপন সংসারের ঘরোয়া বর্ণালি এখানে সমগ্র সংসারের প্রতিকল্প হয়ে উঠেছে। কবি কবিতাটির রচনাকালের এক মাস পরে সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে যে ভুল করে কবিতাটির নাম 'পেয়ালা ও প্লেট' বলে উল্লেখ করেছেন সেটি এক দিগ্‌দর্শী সংকেত বলে মনে করি: 'আবার উল্লেখ করি 'পেয়ালা ও প্লেট' কবিতাটার বিষয়ে। ওই ক্ষুদ্র রচনায় আমি অতিমাত্র... বাস্তবকে ব্যবহার করেছি হৃদয়ের গভীরতম বিচ্ছেদ এবং জন্মমৃত্যুর প্রতীকরূপে— হয়তো এই নির্লজ্জ নিঃশঙ্ক ব্যবহারিক বাস্তবতার কিছু মূল্য আছে।' এখানে উল্লেখ করতে চাই, 'সাতটি তারার তিমিরে' জীবনানন্দ যখন লিখেছিলেন 'চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো— ঘুমে ঘেয়ো/কুকুরের অস্পষ্ট কবলে/হিম হয়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে', তখন নির্লজ্জ নিঃশঙ্ক ব্যবহারিক বাস্তবতা নিজের নিরাবৃত উগ্রতাকে সরাসরি মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। অথচ বক্ষ্যমাণ কবিতায় কবি যথাসম্ভব অনালংকারিক হয়েও কেন শাদা

আপন সংসারের ঘরোয়া বর্ণালি এখানে সমগ্র সংসারের প্রতিকল্প হয়ে উঠেছে। কবি কবিতাটির রচনাকালের এক মাস পরে সম্পাদককে লেখা একটি চিঠিতে যে ভুল করে কবিতাটির নাম 'পেয়ালা ও প্লেট' বলে উল্লেখ করেছেন সেটি এক দিগ্‌দর্শী সংকেত বলে মনে করি...

চোখে ওই দুর্ঘটনাকে আমাদের দেখতে দিচ্ছেন না? তাহলে কি মৃত্যু বা দুর্ঘটনাকে তিনি অস্বীকার করছেন? এটা মেনে নিতে অসুবিধে হয়, কিন্তু সত্যের সৌজন্যে কবুল না করে উপায় নেই যে রবীন্দ্র-রুদ্রাক্ষ হাতে যে-অমিয় চক্রবর্তী মৃত্যুকে এ পর্যন্ত খারিজ করে এসেছেন, এই কবিতায় তিনি আর তা করছেন না। 'লুপ্তির মুহূর্তপারে' দৃষ্টি বিছিয়ে যিনি একদা বলতে পেরেছেন: 'মধ্যে মধ্যে মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, তাই নিয়ে তারো বেশি/চিরন্তন সোনালি কাপড় একখানা' তিনি তাঁর অনুভূত সংক্রান্তিক্ষণের এই নিঃস্বনে ততখানি কবোষ্ণকণ্ঠ হতে পারছেন না, আমাদের কাছে কোনও সান্ত্বনা তুলে ধরছেন না আর। পল্ টিলিচের eternal now তাঁকে এই মুহূর্তে তৃপ্ত করছে না, মৃত্যুকে তাঁর কাছে অবরোধী একটি প্রাচীরের মতো মনে হচ্ছে। ফ্রেডেরিক হোফমানের পর্যালোচনায় 'দুয়ার' ও 'প্রাচীর'— মৃত্যুর এই যে-দুটি প্রতীক আমরা পেয়েছি, রবীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী তাদের মধ্যে প্রথমোক্তটির আশ্রয় দিয়েছেন মানুষকে। কিন্তু এই কবিতায় দেখতে পাচ্ছি উত্তরণের দরোজা মৃত্যুর হাতে আর খুলে যাচ্ছে না। মৃত্যু যখন পুরোভাগে প্রাচীরের মতো এক চরম সম্ভাবনা হয়ে ওঠে, আমাদের আয়ুযাপনের গচ্ছিত সময়টুকু হয়ে ওঠে পরিসরের মতো, স্থানিক বাস্তবতার মতো স্পৃশ্য— যার ভিতরে অবস্থিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুঘনিমা ও অভিজ্ঞতাগুলি হয়ে ওঠে বহুবাঞ্ছিত সঞ্চয়। 'কৃতঘ্ন কালের প্রান্তে' কোনও অতিশায়ী উদ্‌ভাস নেই, কিন্তু তার এই প্রান্তে আছে ইহজীবনের গৃহকৌণিক অস্তিত্বের অঞ্জলিতে সঞ্চিত কয়েকটি অমোঘ মুহূর্ত যা ইন্দ্রিয়ের প্রতিবেদনে ধরা দিচ্ছে না। এই প্রথম কবির স্বীকৃতিতে পাওয়া গেল অসহায়ত্ব, এবং সেইসঙ্গে আত্মজীবনের একটি রণন-স্পৃষ্ট বৃত্তাংশ।

তাই পেয়ালা ও প্লেট— ভরে-ওঠা আর নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দু'টি চূড়ান্ত ঘরোয়া প্রতীক। ভোররাত্রে মৃত্যুর মতো অনিবার্য হবে স্থানান্তর, তার আগে রান্নাঘরের এককোণে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত

দাঁড়ানোর দৃশ্য একান্ত সত্য— যেহেতু সুখপ্রদ, ভোগভুক্ত মুহূর্তগুলির দায়িত্ব নিতে পারা গেল না, কোনও পরিণতির কমনীয়তায় নিয়ে যাওয়া গেল না, সেই ট্র্যাজেডি (তুলনীয়: 'to taste the human tragedy one must taste at the same time the possibility of human happiness for it is only when the two are known together in a single knowledge that either can be known'— Archibald Macleish, Poetry and Experience)। 'সাক্ষী ওরা/সাক্ষী আমি' এখানে ওই অপরাধবোধ ঘনীভূত হয়েছে। কোনও অন্যায় না করেও, পরিণামশূন্য, নির্দোষ সুখ উদ্‌যাপন করেও মানুষ এক ধরনের অন্যায় করতে পারে, যেন সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ অথচ কিছু বস্তুবিষয়। গীতার 'রাজযোগে'র 'আমিই প্রাণীর কর্মফল ও পোষণকর্তা, আমিই প্রভু ও সর্বপ্রাণীর আবাস, তাদের কৃতকর্মের সাক্ষী' (৯।১৮)— এখানে সেই পরম অহংমহান পুরুষের সর্বদর্শিতার ছাপ নেই, বলা বাহুল্য। ব্যবহারকরা সামগ্রী ও প্রাত্যহ বাণিজ্যের ম্লায়মানতার মধ্যেই জ্বলে উঠেছে আত্মতার (identity) অবর্ণনীয় প্রভা। 'চ'-এর বর্ণাবর্তে গৃহঘনিষ্ঠ চিনা মাটির আধার ঝলমল করে উঠেছে স্তম্ভিত কান্নার বিদ্যুতে। 'স্মৃতি' আর 'মৃত্যু'র ঐশ্বর্য ও অবলুপ্তির দ্বৈত প্রকট করবার জন্য কবি 'আলোর জহর' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন— জহরের আরবি অর্থ 'মণি'এবং ফারসি অর্থ 'বিষ', এই কথা স্মরণে রেখে— শুধুমাত্র 'প্রহর' শব্দের মিল দিতে গিয়েই নয় নিশ্চয়। কারো পাত্রে আনন্দের প্রহর এনেছিল ওই অবসানের প্রচ্ছায়া— এই অর্থের সঙ্গে আর একটি তাৎপর্য মেলে যদি 'কারু পাত্র'কে 'কারুপাত্র' বা কারুকাজ করা পাত্র হিসেবে পড়ি। এখানে কীটসীয় শিল্পপাত্র নয়, সঞ্চয়প্রবণ জীবনপাত্রই আভাসিত, সন্দেহ নেই। যেন জীবনের ওই ব্রত শেষ হবার আগেই চলে যাওয়ার সময় হল।

১১ লাইনের আস্থায়ীর এই বিলম্বিত কাতর সংরাগিণীর পরেই একই

ব্যবহারকরা সামগ্রী ও প্রাত্যহ বাণিজ্যের ম্লায়মানতার মধ্যেই জ্বলে উঠেছে আত্মতার (identity) অবর্ণনীয় প্রভা। 'চ'-এর বর্ণাবর্তে গৃহঘনিষ্ঠ চিনা মাটির আধার ঝলমল করে উঠেছে স্তম্ভিত কান্নার বিদ্যুতে।

আকারের অন্তরা পাচ্ছি যার অন্তরঙ্গ হৃদয় পৌরুষের অনতিরিক্ত মহত্ত্বে দৃপ্ত। 'নমস্কার' উচ্চারণের মধ্যেই— তার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করা যায় অভিজ্ঞ ওই মানুষের টানটান দাঁড়াবার ভঙ্গি, সপ্রতিভ, ঋজু; যেন নিয়তির সমস্ত আঘাতের পরেও নগরযুগের মানুষকে আতিথেয় আত্মমর্যাদায় স্মার্ট দাঁড়াতে হবে। প্রতিদিনের নিয়মানুবর্তন, যা-কিছু-যেখানে আছে তাকে হুবহু অনুসরণ করার অভ্যাসের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মৃত্যু— 'Habit is a form of death' (Scott) —মসৃণ আলাপচর্চা ও সুবিন্যস্ত জীবনযাপনের আড়ালে ছিল এই ক্ষমাহীন অনিবার্য। পিছনে পড়ে রইল চিত্রার্পিত কর্ম-জীবনে, পরিত্যক্ত এই ঘরে বেঁচে থাকার সেই ধরন যার সঙ্গে মৃত্যুর এক ফল্গুযোগ ছিল। জীবনের গ্রন্থির মধ্যেই ছিল মৃত্যু আর তারই সন্ধিতে গড়ে উঠেছিল শিল্প। ছদ্ম-অমরতা থেকে মুক্ত এই কবিতাটির আর একটি বিশেষত্ব, কোথাও স্তবকসম্মিতি, অন্ত্যমিল অথবা স্বরসাম্য তথা টেকনিকের দিকটি পাঠকের চোখে পড়ে না। কবিতাটি সম্পর্কে সম্পাদকের কাছে কবির নির্দেশ: 'সামান্য হয়তো নতুন ভঙ্গীতে লেখা কবিতা। আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে বারম্বার প্রুফ দেখে সম্পূর্ণ ভুল-হীন পাঠ ছাপাবেন। কবিতায় সামান্যতম ছাপার ভুল, এমন কি কমা-সেমিকোলনের, সমগ্র কবিতাকে ভ্রষ্ট করে দেয়। সেই ভ্রষ্টতায় আমি প্রবেশ করতে চাই না।' প্রথম মুহূর্ত থেকেই কোলনের প্রবর্তনায় জন্ম-মৃত্যুর যুগ্মতার রহস্যটি আভাসিত হয়েছে এবং ছোট-ছোট ছেদচিহ্নরাশির মধ্যে প্রতিদিনের আঁকিবুকির বর্ণিকাসম্পাত হয়েছে এবং মুহূর্তে যুগ্ম পূর্ণচ্ছেদের মধ্যে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে যেখানে আরব্ধের কাছে পুরুষকার সমর্পিত।

কবিতাটি আমার প্রিয় কবির কাব্যধারায় একটি আপাত-অগোচর স্তরান্তর বহন করে এনেছে বলে মনে হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল বলেও অনুমান করি। সার্থক কবিতা 'জীবনীবন্ধনী' (biographical bondage) পার হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রমাণ করলেন আত্মজীবন-বন্ধনী অতিক্রম না করেও একটি কবিতা— মরজীবনের মরকতমণি— কী-রকম সমবেত অভিজ্ঞান— অর্থাৎ তাঁর ভাষায় 'individual and therefore shared experience' হয়ে ওঠে।

অরুণ সেন

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে কিছুকাল ধরে যে কথাগুলো মনে জমছিল, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'বাসা-বদল' প্রসঙ্গে লেখাটি পড়ে সেই কথাগুলোই যেন ঘুরে ফিরে এল। অলোকরঞ্জনবাবু আলোচনার শেষাংশে বলেছেন, 'কবিতাটি আমার প্রিয় কবির কাব্যধারায় একটি আপাত-অগোচর স্তরান্তর বহন করে এনেছে বলে মনে হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল বলেও অনুমান করি।' (কবিতাটি খুবই সাম্প্রতিককালে রচিত— ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে)। অর্থাৎ এর পূর্বে অমিয় চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদ অ-সম্পূর্ণ ছিল। অমিয় চক্রবর্তী যে রবীন্দ্রজগতেরই মানুষ, এটা অনেকেরই বহুদিনের সিদ্ধান্ত। এবং, আশ্চর্য, অধিকাংশ জনপ্রবাদের মতো এটা নিতান্তই অমূলক নয়। এমনকী অলোকরঞ্জন-আলোচিত কবিতাটি পড়েও ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই সিদ্ধান্তকে সংশোধন করার তাগিদ পাচ্ছি না।

অলোকরঞ্জনবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি সানাই-এর, 'বাসা-বদলে'র কথা তুলেছেন। দুটি কবিতা পাশাপাশি রেখেও আমার মনে হল না যে কবিতাটিতে মৌলিকভাবে কোনও ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে হয়েছে। কিছু নতুন পরদা লেগেছে— যেমন মার্কিনপ্রবাস প্রসঙ্গ, কিছু হালের শব্দ এবং সর্বোপরি বলবার ভঙ্গিটি। এই ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ নতুন এবং আধুনিকোচিতভাবে সংক্ষিপ্ত ও তির্যক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার অন্যান্য তুলনীয় কবিতা প্রসঙ্গেও একই কথা বলা যায়। 'প্রসঙ্গ-প্রকরণ অদ্বৈত এবং বলবার ভঙ্গি নতুন হলে অভিজ্ঞতাও নতুন'— ইত্যাদি কথা খুবই সাধারণ সত্য, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, একই অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে, পুঁজি করে কেউ কেউ আপাতস্বতন্ত্র সুর এনেছেন নিছক স্টাইলের ভিন্নতায়। যে-কোনও দেশের যে-কোনও যুগের কবিতার ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যেও সেই অর্থে, অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভাষ্য অনুসরণ করে বলছি, বিশিষ্ট পদরচনা ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত বিবেচ্য।

অবশ্য এই স্টাইল বা রীতিও খুব মহার্ঘ ব্যাপার এবং অমিয় চক্রবর্তী এই বিশিষ্ট রীতি উপার্জন করেছেন দীর্ঘ অধ্যবসায়ে এবং একাগ্রতায়— তারও ইতিহাস আছে, ধারাবাহিকতা ও পরিণতি আছে। নিতান্ত এ-কারণেও বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরন্তু তাঁর কবিতায় আছে বাংলা কাব্যে অভিনব বহু উপাদান— তাঁর ছন্দের খোলা কান, তাঁর গৃহকাতর বিষাদ, তাঁর মার্কিন কবিতার সাঙ্গীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি নতুন কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের দিয়েছেন, এ-কথা স্বীকার করতে আমি নারাজ। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের জগতই যেহেতু তাঁর পাদপীঠ, তাঁর ভিত্তিভূমি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আবহ তাই রীতির এই পরীক্ষানিরীক্ষা ও সচেতনতা বরং তাঁর কবিতার বিষয়কে খানিকটা অকারণে অস্পষ্ট এবং ইমেজকে অস্বচ্ছ করে তুলেছে যা রবীন্দ্রনাথের সহজ ভঙ্গির কবিতায় অভাবিত ছিল। অর্থাৎ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটা বিরোধও বোধহয় আছে এই সূত্রে: তাঁর সচেতন ও জটিল আঙ্গিকচর্চার সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রজগৎ-লালিত মানবিকতা এবং তাঁর সরল, নির্দ্বন্দ্ব অনুভূতির।

অবশ্যই তাঁর স্টাইল কতকগুলি অমোঘ লিরিকের জন্ম দিয়েছে— এ রকম অজস্র উদাহরণ প্রত্যেকেরই মনে পড়বে— যেখানে অমিয় চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব তর্কাতীত। কিন্তু মহৎ কাব্যের নতুন অভিজ্ঞতার চাপ আমি এখানে পাই না।

এই স্টাইল বা রীতিও খুব মহার্ঘ ব্যাপার এবং অমিয় চক্রবর্তী এই বিশিষ্ট রীতি উপার্জন করেছেন দীর্ঘ অধ্যবসায়ে এবং একাগ্রতায়— তারও ইতিহাস আছে, ধারাবাহিকতা ও পরিণতি আছে। নিতান্ত এ-কারণেও বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অলোকরঞ্জনবাবুও নিশ্চিত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর তফাত এযাবৎকাল সামান্য ছিল। কিন্তু এ কবিতা প্রসঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত ভাঙতে হল কেন? 'রবীন্দ্র-রুদ্রাক্ষ' অমিয় চক্রবর্তী ত্যাগ করেছেন বলে মনে হল কেন? তাঁর আলোচনা থেকে দুটি বাক্য উদ্ধার করছি: ১। 'আলোচ্য কবিতায়...একান্ত ভারতবর্ষী মানুষের মনে শিকড়িত মায়াভরা সংসারের কান্না মূর্ছিত হয়ে আছে' এবং ২। ...মৃত্যুকে এ পর্যন্ত খারিজ করে এসেছেন, এই কবিতায় তিনি আর তা করছেন না।' বলা বাহুল্য দুটি বাক্যই অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে লেখা। কিন্তু, 'মায়া' প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জনবাবু যে দীর্ঘ বাগবিস্তার করেছেন, তা কি রবীন্দ্রজগতে নিষিদ্ধ? কমলকুমার মজুমদারের 'মায়া'র সঙ্গে যদি মেলাতে পারেন, তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয় কেন? দ্বিতীয়ত, তিনি আর মৃত্যুকে খারিজ করতে পারছেন না, এ-কথা তাঁর মনে হল কেন? আমার মনে হয়নি— আলোচনায় উদ্ধৃত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতেও নয়, অলোকরঞ্জনবাবুর পরবর্তী ব্যাখ্যাতেও নয়। আমার কাছে এই কবিতাটি— অমিয় চক্রবর্তীর অন্য বহু লিরিকের মতোই— বিরহ বা বিচ্ছেদের কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তির বিরহের মধ্যে যেমন বিশ্বনিখিলের বিরহ ধ্বনিত, তেমনি এখানেও সেই অর্থেই বিচ্ছেদটা প্রতীকী হয়ে উঠেছে। এর বেশি জুলুম করা অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তফাতটা চোখে পড়ে শুধু বলার ভঙ্গিতে।' এই প্রথম কবির স্বীকৃতিতে পাওয়া গেল অসহায়ত্ব...'। বোঝা গেল না, তাঁর পূর্ববর্তী অসংখ্য বিরহের ও বিচ্ছেদের লিরিক কবিতায় যে-কথা স্পষ্ট হয়নি, তা হঠাৎ এখানে স্পষ্ট হল কী করে? অলোকরঞ্জনবাবু ঠিক কোথায় তফাত করেছেন? রবীন্দ্রনাথের 'বাসা-বদল' প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন বলেছেন, এতে আছে 'অর্ধ-অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস' বা 'শৌখিন হৃদয়রঙ্গ'— কিন্তু বুঝিয়ে বলেননি, কিংবা বলা ভালো, আমার তা মনে হয়নি। আলোচনায় উদ্ধৃত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি কিংবা অলোকরঞ্জনবাবুর এই কথা: এ 'কবিতায় তিনি আর তা [মৃত্যুকে খারিজ] করছেন না' ইত্যাদিকে যদি কারো আরোপিত মনে না-ও হয়, তিনিও মানবেন: রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতেও আছে 'নিদারুণ বেদনা' কিংবা বাস্তব বর্ণনার প্রতীকমূল্য (অন্তত অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির অর্থে)।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংকলন বছর
(মাস অনুল্লিখিত) সম্ভবত ১৯৬৬ সাল

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা
কালের কষ্টিপাথর
এবার অর্ধেকেরও কম দামে
২০১৪-র জানুয়ারি থেকে
'কালের কষ্টিপাথর' প্রতি মাসের
১০ তারিখে প্রকাশিত হবে।
প্রতি সংখ্যার দাম ৩০ টাকা হলেও,
আরও বেশি পাঠককে আকৃষ্ট করার
জন্য এই জানুয়ারি থেকেই বার্ষিক
গ্রাহকেরা এর অর্ধেক দামে নিয়মিত
পত্রিকা পাবেন। ৬ জানুয়ারির মধ্যে
৩৬০ টাকার বদলে মাত্র ১৮০ টাকা
পাঠিয়ে যাঁরা গ্রাহক হবেন, তাঁরা
জানুয়ারি থেকেই সারা বছর
অর্ধেক দামে পত্রিকা পাবেন।

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

উত্তর লিখেছেন: তরুণ সান্যাল

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। — সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কীরকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১। আমি তো মনে করি, সর্বকালে, সর্বযুগে, সব কবিকেই, স্ব-কালের জীবনচৈতন্যকে রাজনীতি প্রভাবিত করে থাকে। আর, যখন কোনও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রূপান্তরের সম্মুখীন হয়, কবি সোজাসুজি তাঁর শিবির প্রকাশ্যেই বেছে নেন। আমাদের দেশ তো এখন এক ধরনের রূপান্তরের মুখোমুখি, একথা ঠিকই, আমার কিন্তু মনে হয় আমাকে বিশ বছর আগে যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা নাড়া দিত, এখন ঠিক তেমন ভাবে নাড়া দেয় না। ভিতরে ভিতরে গুণগত হয়তো কোনও রূপান্তর এসেছে। আমার কাছে, সে-সব ঘটনা যেন অনেকখানিই জানা। আমি তো বিশ বছর আগেও জানতাম, দেশটার মধ্যে উত্তাপ বাড়ছে। আমি তো বুঝতাম, দেশের মধ্যে শোষিত মানুষ ক্রমশ শক্তি অর্জন করছে। আমার স্পষ্ট ধারণার মধ্যে ছিল, ভারত পুঁজিবাদী আর্থনীতিক বিকাশের রাস্তা কালৌচিত্যহীনতা দোষে দুষ্ট, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সে বিকাশের ধারাটি ব্যর্থতার মজা জলায় গিয়ে কিছু পাঁকই সঞ্চয় করবে মাত্র। তাই বরং, একটু উলটো, আমি তো সময়ের ফণার মাথাতেই ছিলাম, এখনও আছি। আমি তো হাওয়ার মোরগ হতে চাইনি। সামান্য ঝড় বৃষ্টি আর আমাকে নাড়া দেয় না। পলকা হাওয়ার দাপটে অনেক আগাছাও ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ে। আমি অনেকদিন এদেশের রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদির জলহাওয়া গায়ে ধরেছি। অনুভব ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেকখানি ধাতস্থ হওয়ার মতো ক্ষমতা যেন আমার উপরি পাওনা হয়েছে। আমি তো আরও সংযমী, সচেতন ধ্রুব আঘাতের আক্রমণ চাই; 'তীব্র সামাজিক অস্থিরতা' নয়। 'তীব্র সামাজিক অস্থিরতা' তো আসলে সিমটম, ধীর ও দ্রুত নানা গতিতে অব্যর্থভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থার গভীর তলায় সময়ের চোরা স্রোত একেবারে মূলটাই খেয়ে নিয়েছে, এখন একটু মাটির ওপরের ছটফটানিতে অত নাড়া খেয়ে গেলে চলে?

> এত বীরত্ব, এত অশ্রু, রক্তপাত, কোনও যুগ কোনও দিন দেখেনি। যে মানুষকে এই ত্যাগ ও নিষ্ঠা এই বীরত্ব ও মহানুভবতা নাড়া না দেয় সে কি মানুষ নামের যোগ্য? কবি হওয়া তো দূরের কথা। আমরা যে যুগে বাঁচছি সে যুগ কেমন প্রকৃতিকে বশ করে মুক্ত হওয়ার সময়, যন্ত্রশিল্পবিকাশের তাৎপর্যে, যেমন তা জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিপ্লবের তেমনি সমাজবিপ্লবের। এমন সময় পৃথিবীতে কবে এসেছিল?

কেমনভাবে 'তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা লেখার সময়' আমাকে প্রভাবিত করে, তা তো বলা খুবই মুশকিল। আমি তো আগেই বলেছি, এ জলহাওয়ায় তো এতদিন হাড় শক্ত হল, চামড়া কড়া হল।

আমার ছোটখাটো ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্সের কথাই না হয় বলি। মাস-কয় আগে, এই গত শীতে, মাঠ থেকে ধান ওঠার সময় আমি হাসনাবাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় গিয়েছিলাম। মেঠো রাস্তা। মাঝে-মধ্যে মিষ্টি জলের খাঁড়ি। দূরে দূরে উঁচু বাঁধ। পাছে নোনা জল ঢুকে পড়ে তাই নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁধ। সুন্দরবন খুব বেশি দূরে নয়। গত শতকের শেষ দিকে এ অঞ্চলের জঙ্গল কাটা হয়েছিল। জঙ্গল কাটতে দেশি-বিদেশি জমির ইজারাদাররা মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে ভূমিহীন চাষি, আদিবাসী চাষিদের জমির লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছিল। ১৭৯৩ সালের কর্নওয়ালিশের কেরামতিতে যখন চাষির জমি গেল, জমিদার পত্তনিদার-দরপত্তনিদার সেপত্তনিদারের উঁচু খাজনা-হাঁকা জমি বন্দোবস্তের যখন যুগ এলো, কী সমভূমিতে, কী জঙ্গলমহলে চাষির জমি হাতছাড়া হল। সেই নির্বিত্ত চাষিরা এলো এই

অঞ্চলে। এলো বাঙালি, ওঁরাও, সাঁওতাল অনেকে। কিন্তু জমি কোথায়? জঙ্গল আর জঙ্গল। বনে বাঘ, জমে কুমির, কামট, জঙ্গলে কুড়োল ছোঁয়াতে সাপের ছোবল। এবং মৃত্যু। বিষ কেউটে। প্রতি জঙ্গল কাটার পিছনে এক-একটি লাস। কিন্তু জমি থেকে গাছের শূলো-শিকড় তুলে ফেলতে বছর গড়ায়। মৃতপ্রায় চাষি কোথায় পালাবে? তা চাইলে, হাত-পা বেঁধে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া, বাঘে খেয়ে নেবে। তারপর জমি তৈরি হল। নতুন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে উঁচু খাজনা পেয়ে, ইজারাদাররা জমি পত্তন দিল, হাজার বিঘা, লাটের পর লাট। যারা জমি বানাল তারা হয়ে গেল ভাগচাষি, খেত মজুর। সুন্দরবনে মধুকাটা, গোলপাতার জোগানদার যাঁরা প্রতি বছর বনবিবির পুজো দিয়ে কাঁচাখেকো দেবতা দক্ষিণ রায়ের বনে ঢুকে প্রতি বছরই এখনও প্রাণ দেয়, তাঁরা সেই প্রতারিত চাষিদেরই সন্তান। ইজারদারকে দেওয়া উঁচু হারের খাজনা তুলে নেবার জন্য চাষির ওপরে চেপে বসল হাজার পাওনার মারণফাঁস। আঃ কি দুঃখের যন্ত্রণার যুগ! যেখানে জঙ্গল নেই সেখানে জমিদার-জোতদার মহাজন। যেখানে জঙ্গল সেখানে বাঘ, কেউটে, হাঙর, কুমির। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা নাকি উঠল। কিন্তু নামে বেনামে ওই বড় লাটদারেরা, জোতদারেরা হাজার হাজার বিঘে রেখে দিল। জঙ্গলের আইন। কে মুখ ফুটে এ কথা বলে। জ্যান্ত গোর যেতে হবে না! এ বছর ১৯৭০, এই যেখানে চাষি বর্শা লাঠি, তির ধনুক হাতে বেনামি জমি দখল করেছে। বলেছে, জমির মালিক ন্যায্য কাগজপত্র দেখিয়ে ভাগের ধান নিয়ে যাও। সম্প্রতি তো সারা ভারত জুড়েই চলেছে জমির লড়াই। পঁচাত্তর বিঘার বেশি জমি থাকলে, তা দখল করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, চাষাভুষো ও-সব দখল করছে কেন? সরকারই তো আছে। রুপোর জুতোয় যেমন বহু কবি-লেখকের কলম তর তর করে অশ্লীলতা প্রভৃতির প্রবল চাপে বয়ে যায়, তেমনি সরকারি চাকুরে কি পুলিশ, কি ভূমি বন্দোবস্তের জন্য নিযুক্ত চাকুরে— সবারই একই হাল। তা হলে চাষি কী করবে? আমি যখন সে অঞ্চলে গেলাম, দেখলাম হাজার হাজার চাষির চোখে সূর্য জ্বলছে, হাতে ঝকঝক করছে বল্লম, হাঁসুয়া, খাঁড়া। একজন ভূমিহীন আদিবাসী পিঠের কাপড় তুলে দেখালেন বাবুদের কোড়ার দাগ, ক-বছর আগেকার। তাঁরা গান গাইছিলেন! গলার মধ্যে আবেগের চাপ অনুভব করছিলাম আমি। একে কি বলব 'ইমোশনাল এক্সপেরিয়ান্স'? আর এ এক্সপেরিয়ান্স অর্গানাইজ করার জন্য সময় লাগে না। যদি আমার অনুভবের জগতের সঙ্গে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ভুবনের সঙ্গে ওই গ্রামের চাষিরা আমাকে যে অভিজ্ঞতা দিলেন, সেগুলির মধ্যে সত্যিকারের সম্পর্ক থাকে, তবে আমার পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব। আমি এদেশের বিপুল ভূগোলের মানুষগুলি থেকে এই ধরনেরই ইমোশনাল এক্সপেরিয়ান্স চাই। এবং আমি তা পাচ্ছিও। এখনি তো কবিতা লেখার যুগ। ভিয়েতনামের কথা মনে হয়? কবে কোন কালে মানুষ তার নিজ মর্ত্যসীমা এমন ভাবে চূর্ণ করেছে? এত বীরত্ব, এত অশ্রু, রক্তপাত, কোনও যুগ কোনও দিন দেখেনি। যে মানুষকে এই ত্যাগ ও নিষ্ঠা এই বীরত্ব ও মহানুভবতা নাড়া না দেয় সে কি মানুষ নামের যোগ্য? কবি হওয়া তো দূরের কথা। আমরা যে যুগে বাঁচছি সে যুগ কেমন প্রকৃতিকে বশ করে মুক্ত হওয়ার সময়, যন্ত্রশিল্পবিকাশের তাৎপর্যে, যেমন তা জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিপ্লবের তেমনি সমাজবিপ্লবের। এমন সময় পৃথিবীতে কবে এসেছিল?

২। যা জীবন, প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ড সচেতনতার আরেক নাম সেই রাজনীতিক সচেতনতা কবিতা রচনার নতুন ক্রান্তিকাল বহে আনে। তবে সময় বদলের মতো কবিতাতেও তো নানা বদল আসে। আমি তো দেখছি, কবিতা বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। বহু অঞ্চলে দেখেছি, কবিতাপাঠে লোকজনের আগ্রহ। তবে সময়ের যোগ্য কবিতা চাই।

না। বাঙলা কবিতা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়নি, কবিতা সমাজবিচ্ছিন্ন হলে তা আর যাই হোক কবিতা হতে পারে না। তবে এক ধরনের কবিতা-কবিতা ব্যাপার সমাজবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে।

বাংলার সমাজমানসে কবিতার প্রভাব অসাধারণ। কবিতা যদি এক অর্থে 'উচ্চবর্গের আলাপচারিতা' বা হাইটেনড স্পিচ হয়ে থাকে, তবে এখন বাংলাদেশে কবিতারই ছড়াছড়ি। গ্রামের চাষিও নাটক বলতে যাত্রা শুনছেন। শহরে নাট্যশালাতেও কবিতার আমদানি হয়েছে। যে বক্তা রাজনীতিক বক্তৃতা দিচ্ছেন, আবেগ ও যুক্তি তিনি আশ্চর্য সমীকরণে ধরছেন। গ্রামের চাষি যখন আলোচনা সভায় কিছু বলতে উঠছেন, চিত্রবিধৃত বাক্যবন্ধে তিনি কথা বলছেন। গ্রামে গ্রামে নতুন গান ছড়িয়ে যাচ্ছে। গীতি কবিতা। তবে কলকাতার লোক, বিশেষভাবে সমাজবিচ্ছিন্ন কবিদের উত্তরাধিকারীরা ব্যাপারটা ধরতেই পারছেন না। এখন তো কবিতা কথায় আচরণে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে শিরায় শোনিতের প্রবাহে নন্দিত, বিদ্যুচ্চকিত।

৩। কখনও-কখনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেছি মুখের ভাষাই জয়ী হয়। তবে মুখের ভাষার সঙ্গে এক ধরনের প্রায় ধ্রুপদী শব্দের স্বাভাবিক মিশ্রণ ঘটে যায়। যেমন জনসভায় হয়। বক্তা খুব সরল সহজ শব্দ ব্যবহার করেন, আবার সেই সহজ শব্দবন্ধকে একটু উচ্চবর্গের রূপ দিতে জনমনে প্রোথিত কাহিনি, এবং কিঞ্চিৎ সাধু ও নাটকীয় শব্দ যেমন প্রয়োজন হয়, কবিতাতেও তেমনি অতি মেঠো অনুষঙ্গের সঙ্গে ধ্রুপদী অনুষঙ্গ ও শব্দ আনার প্রয়োজন বোধ করি। কবিতাকে আমি মুখের ভাষার কাছাকাছি আনতে চাই কিনা, ওপরের অংশটিতেই তার উত্তর আছে। সকল কবিই নিজস্ব এক কাব্যভাষা, সাধারণ শব্দরাজি থেকে গড়ে তোলেন। কবি ওই শব্দগুলিতে সর্বসাধারণের অনুষঙ্গকে পার্টিকুলারের রূপ দেন, এবং ইনডিভিডুয়াল অনুষঙ্গকে ইউনিভার্সাল করার প্রচেষ্টা চালান। আমারও তো তাই লক্ষ্য!

কবিতার ভাষা সব সময়েই জনসাধারণের। তবে কবিতার ফর্মের জন্য তা একটু ভিন্নতর সংগঠনের তাৎপর্য গড়ে তোলে। এবং তা আগেও ছিল, এখনও আছে।

৪। সব সময় না। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বলতে কী— বাজারে তেল নেই চালের মধ্যে বড়ই কাঁকর, রেশন পেতে দুদিন দেরি হল, আত্মীয়র মেয়ের বিয়েতে কী কিনে দেওয়া যায়, এ-সব কথাই কি বলতে চায়? না, এগুলি কবিতার মূল বিষয় নয়। কবিতায় অনুষঙ্গ হিসাবে আসতে পারে। কবিতা আসলে যদি সময়কে ধরতে চায়, তাহলে কবিতা সময়ের সারাৎসারকে ইতিহাসের নির্যাসকে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। এবং সমসাময়িক কোনও প্রসঙ্গ ওই ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট স্তরের, কোনও মৌল সমস্যাকে অভিব্যক্ত করার কাজে কবিতায় সঞ্চারিত হয়। কবিতাকে কবিতা হয়ে ওঠার ব্যাপারে ওই সঞ্চার আবশ্যিক ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাম্য। কিন্তু প্রায়শই অনুষঙ্গ হিসাবে, নির্বিশেষ লক্ষ্য হিসাবে নয়। লক্ষ্য ইতিহাসের সারাৎসার। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক রচনায়, প্রকৃতি ও সমাজের নিয়ম জেনে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজকে সুস্থ করে জীবনকে মুক্ত, স্বাধীন করে তোলাটাই যে সারাৎসার অনুধাবনের আসল শিক্ষা।

৫। অনুকূল, খুবই অনুকূল।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ষাটের দশকের মহানগর থেকে দু'টি চিঠি

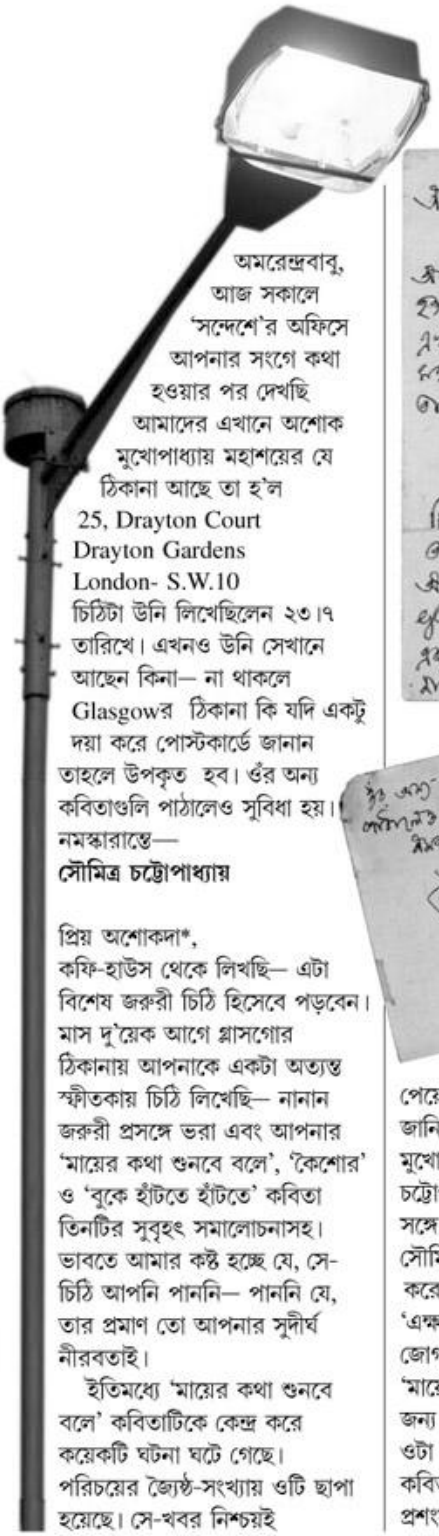

অমরেন্দ্রবাবু,
আজ সকালে 'সন্দেশে'র অফিসে আপনার সংগে কথা হওয়ার পর দেখছি আমাদের এখানে অশোক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে ঠিকানা আছে তা হ'ল
25, Drayton Court
Drayton Gardens
London- S.W.10
চিঠিটা উনি লিখেছিলেন ২৩।৭ তারিখে। এখনও উনি সেখানে আছেন কিনা— না থাকলে Glasgowর ঠিকানা কি যদি একটু দয়া করে পোস্টকার্ডে জানান তাহলে উপকৃত হব। ওঁর অন্য কবিতাগুলি পাঠালেও সুবিধা হয়।
নমস্কারান্তে—
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

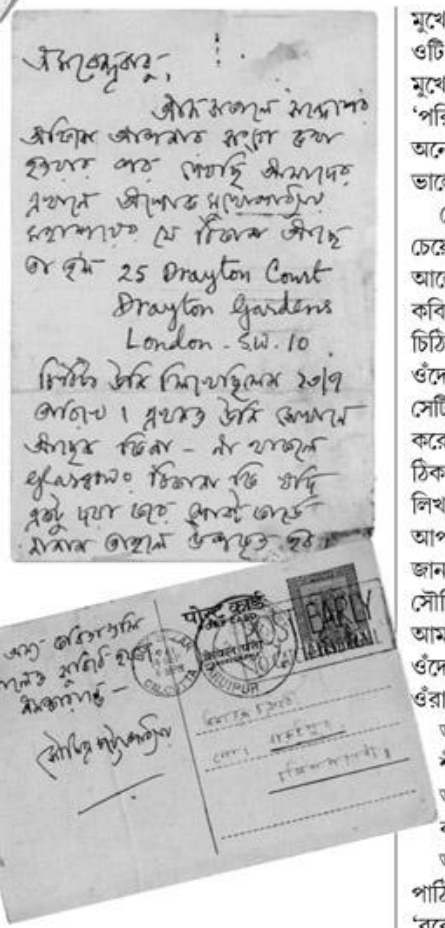

প্রিয় অশোকদা*,
কফি-হাউস থেকে লিখছি— এটা বিশেষ জরুরী চিঠি হিসেবে পড়বেন। মাস দু'য়েক আগে গ্লাসগোর ঠিকানায় আপনাকে একটা অত্যন্ত স্ফীতকায় চিঠি লিখেছি— নানান জরুরী প্রসঙ্গে ভরা এবং আপনার 'মায়ের কথা শুনবে বলে', 'কৈশোর' ও 'বুকে হাঁটতে হাঁটতে' কবিতা তিনটির সুবৃহৎ সমালোচনাসহ। ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে যে, সে-চিঠি আপনি পাননি— পাননি যে, তার প্রমাণ তো আপনার সুদীর্ঘ নীরবতাই।

ইতিমধ্যে 'মায়ের কথা শুনবে বলে' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। পরিচয়ের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় ওটি ছাপা হয়েছে। সে-খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন। গ্লাসগোর চিঠিতে আমিও সেটা জানিয়েছিলুম। সেদিন কথায়-কথায় (সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আমি এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: সন্দেশের অফিস) আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে জানতে পেরে সৌমিত্র আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন— আমি যেন আপনার কবিতা 'এক্ষণে' প্রকাশের জন্য আপনার কাছ থেকে জোগাড় করে দিই। সৌমিত্র বললেন- 'মায়ের কথা শুনবে বলে' ওঁরা এক্ষণের জন্য প্রায় প্রেসে দিয়ে দিয়েছিলেন, হঠাৎ ওটা 'পরিচয়' প্রকাশ করে দিলো। কবিতাটির উচ্ছ্বসিত (সত্যিই উচ্ছ্বসিত) প্রশংসা করলেন সৌমিত্র। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সৌমিত্র জিজ্ঞেস করলেন ওটি উনি পড়েছেন কিনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যা বললেন, হুবহু তুলে দিলুম— 'পরিচয়ে পড়বার মতো কবিতা বেরয়ই না। অনেকদিন পর এ-কবিতাটি পড়ে সত্যিই ভালো লেগেছে।'

সৌমিত্র পরে আমাকে আপনার কবিতা চেয়ে চিঠিও লিখেছেন। অবশ্য সেদিনের আলোচনায় আমি বলেছিলুম— প্রকাশিত কবিতাটি ছাড়া আরো দু'টি কবিতা একই চিঠিতে আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ওঁদের কাছে আপনার যে ঠিকানা আছে সেটি লন্ডনের— আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সৌমিত্র—এখনও আপনাকে ঐ ঠিকানায় পাওয়া যাবে কিনা। ওঁরা চিঠি লিখবেন আপনাকে কবিতার জন্য। আপনার ভাই সমীরকে চিঠি লিখে জানলুম— আপনি এখন লন্ডনেই আছেন। সৌমিত্রদের তাই জানিয়ে দিলুম আজ। ওঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন— আমি যেন ওঁদের হয়ে আপনাকে চিঠি লিখি একটা। ওঁরা তো লিখবেনই।

আপনি এই চিঠি পেলেন কি না শীগ্‌গীরই জানাবেন। চিন্তায় থাকবো। আগের চিঠিটা কোনোরকমেই কি উদ্ধার করতে পারেন না? তা-ও জানাবেন।

আমার কাছে আপনি যে তিনটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, তার দুটো ('কৈশোর' এবং 'বুকে হাঁটতে হাঁটতে) সৌমিত্রদের দিয়ে দিয়েছি এক্ষণের জন্য। আবার 'বুকে হাঁটতে হাঁটতে' আমার এক বন্ধু 'অবসর'-এর পুজোসংখ্যার জন্য জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। সৌমিত্রদের সে-কথা জানিয়েছি। ও-দুটো আর কোথাও বেরয়নি তো? ১৮ই সেপ্টেম্বরের 'আনন্দমেলা'য় আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। আমার 'কলেজ পত্রিকা' অভূতপূর্ব প্রশংসা পাচ্ছে। এখন আর কিছু লিখছি না। মন অত্যন্ত অশান্ত। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।।

---

*অশোক মুখোপাধ্যায়
**স্থানাভাবে দুয়েক পংক্তি সংক্ষেপিত
***বানান অপরিবর্তিত

অশোক মুখোপাধ্যায়

অশোক মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত পাঁচটি কবিতা

এক কিশোর সম্পাদকের ঠিকানায়

শিবপুর বি-ই কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় এক বন্ধুর কাছে একটা পত্রিকা দেখলাম। পত্রিকার নাম 'বন্ধু'। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মপ্রকাশের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বা ওইরকম কিছু একটা ঘোষণা ছিল মলাটে। ঠিকানা বারুইপুর, ২৪ পরগনা। পত্রিকাটার অধিকাংশ লেখাই ভালো লাগল। বেশ আন্তরিক ও খাঁটি লেখা। সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

আমার তখন কলেজে সারাদিন যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা পাঠের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও চলছে। কলেজের বার্ষিক পত্রিকায় দুয়েকটা লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

একদিন সদ্যরচিত খুব অন্য ধরনের একটি নাতিদীর্ঘ নাটক নিয়ে শিয়ালদা থেকে স্টিম ইঞ্জিনের রেলে চড়ে বারুইপুরে নেমে খুঁজে খুঁজে সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

একজন কিশোর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে বসাল। হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি গায়ে। সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, এই কিশোরই সম্পাদক জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম। আরও অবাক হয়েছিলাম কয়েক ঘণ্টা সম্পাদকের অনর্গল কথা শুনে। আমার নাটকটি তাঁর ভালো লেগেছিল। যথাসময়ে ছাপাও হয়েছিল। তার চেয়ে বড় কথা, সেদিন আমাদের অজ্ঞাতে গড়ে ওঠা সেই অসমবয়সি বন্ধুত্ব মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ অসাক্ষাৎ সত্ত্বেও অর্ধশতক পার করেছে ভেবে আনন্দ পাই।

অশোক মুখোপাধ্যায়

মায়ের কথা শুনবে বলে

কতটুকু আর পথ, ভেবেছিলাম সূর্যের মুখ
দেখতে দেখতে চলে যাব।

কারণ আমরা পৃথিবীর কণ্ঠ শুনতাম। বিশ্বাস
করতাম অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক। এখন সভ্যতা,
সংস্কৃতি এবং জীবন।

তারপর ওরা দাবানল জ্বালল। চুষতে লাগল
শিশুর হাড়। কত নারীর কাঁচা মাংসে লালসা পেল
তৃপ্তি। রক্তের মেঘে আকাশ লাল হল। সবাই
বলল, ওরা নাকি মায়ের কথা শুনবে।

আহা, কত অশ্রু, কত কাহিনি! ভেবেছিলাম
সূর্যের মুখ দেখতে দেখতে চলে যাব। কারণ
আমরা পৃথিবীর কণ্ঠ শুনতাম। বিশ্বাস করতাম
অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক। এখন সভ্যতা, সংস্কৃতি
এবং জীবন।

একচক্ষুদানব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে
বলল, কই অন্ধকার কই! দেখছ না আমি আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি?

হারানো পৃথিবী

(আর্য খানের জন্য)

আমার কিশোরবেলা প্রকৃতির বড় দয়া ছিল
প্রাণভরে ডাকলেই বৃষ্টি নেমে যেত
রেনি ডে, স্কুল ছুটি, ভিজে কাক হয়ে
জলকাদা গায়ে মেখে ভর সন্ধ্যাবেলা
মা'র চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ফিরে আসা।

আমার কিশোরবেলা স্নেহ-ভালোবাসা
ছেয়ে ছিল চরাচর
আলো আর বাতাসের মতো,
শাসনের রক্তচক্ষু মেলার আগেই
দাদু-দিয়া এমনকী পাড়ার মাসিমা
ঝাঁপিয়ে পড়ত এসে কত মমতায়
আদরে ভরিয়ে দিত মনেই হত না
কোনও দুঃখ-কষ্ট আছে জগৎ-সংসারে।

আমার কিশোরবেলা সবকিছু ছিল যেন বড়ই সেকেলে
ঠাকুরমার ঝুলি খুলে কুপির আলোয়
ভেজা চোখে পড়তাম দুখু'র কাহিনি।
ঘরের টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ
শুনে শুনে ঘুম আসত অনিচ্ছুক চোখে,
তারপর পাড়ি দিয়ে সাত সমুদ্দুর
কলাবতী রাজকন্যা মেঘবরণ চুল
খুঁজতাম তাকে আর শিতিপঙ্খ নাও।

কোথায় হারিয়ে গেল সেই পৃথিবীটা।

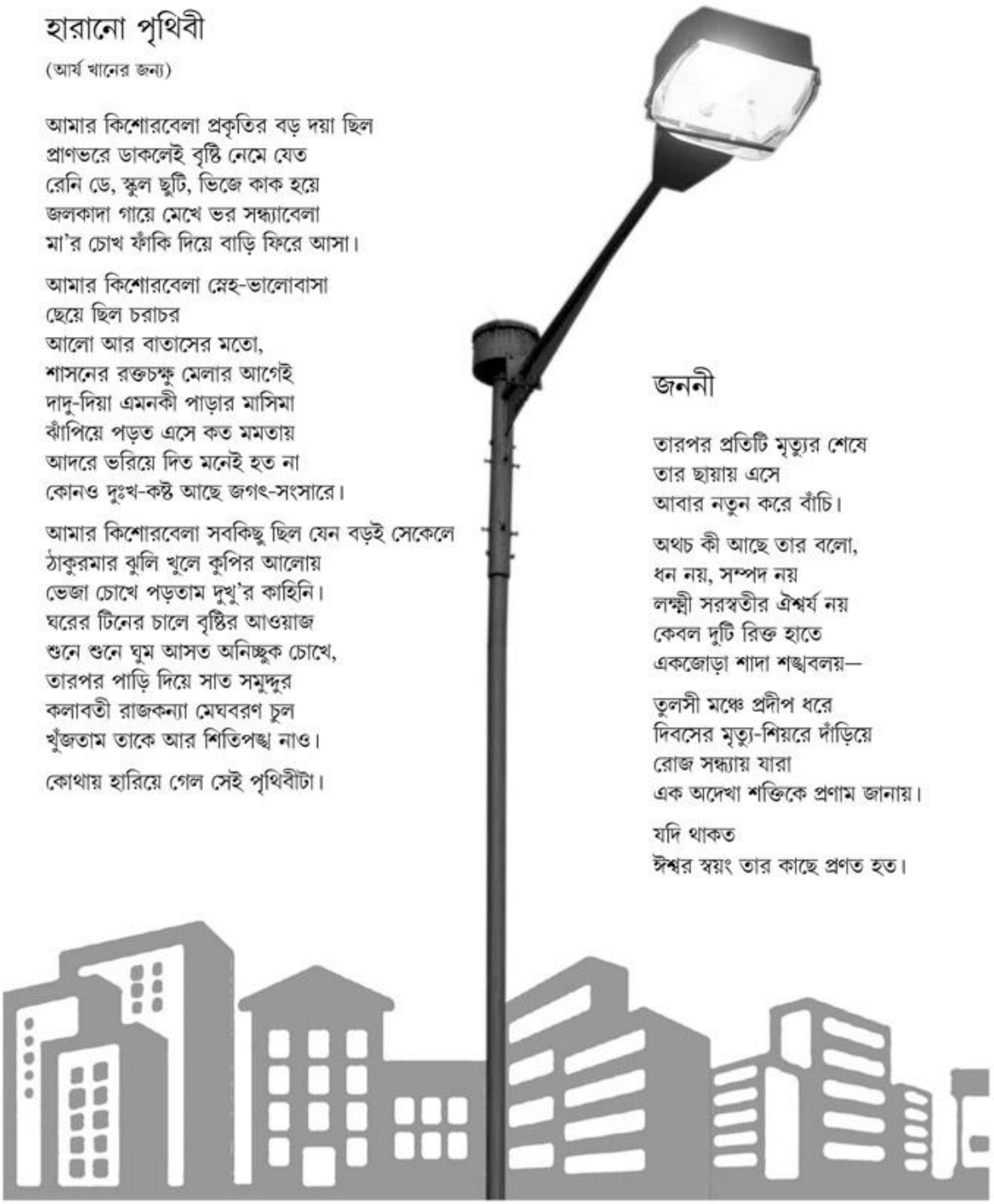

জননী

তারপর প্রতিটি মৃত্যুর শেষে
তার ছায়ায় এসে
আবার নতুন করে বাঁচি।

অথচ কী আছে তার বলো,
ধন নয়, সম্পদ নয়
লক্ষ্মী সরস্বতীর ঐশ্বর্য নয়
কেবল দুটি রিক্ত হাতে
একজোড়া শাদা শঙ্খবলয়—

তুলসী মঞ্চে প্রদীপ ধরে
দিবসের মৃত্যু-শিয়রে দাঁড়িয়ে
রোজ সন্ধ্যায় যারা
এক অদেখা শক্তিকে প্রণাম জানায়।

যদি থাকত
ঈশ্বর স্বয়ং তার কাছে প্রণত হত।

প্রবাসী ছেলের পত্র মুমূর্ষু পিতাকে

আমি শিগগিরই ফিরে আসছি
বাবা, তুমি বেঁচে থেকো।

দেশ ছাড়ার আগে
তোমাকে প্রণাম করে যখন বললাম
বাবা এখন যাই,
তুমি বিষণ্ন দু'চোখ তুলে বলেছিলে,
যাই না, আসি কইতে হয়।
তারপর দূর আকাশের দিকে চেয়ে বললে,
আমি তগো কিছুই বুঝি না।
সাত সমুদ্র ত্যারো নদীর পারে
ক্যান তোরা ছুইটা যাস, কি আছে ওই দ্যাশে!
আমাগো জমির ধানে আউশে আমনে
সম্বৎসর গোলা ভইরা থাকে,
পুকইরের চাইর পাশে দু'চউখ জুড়ানো
দেবভোগ্য সবুজ ভান্ডার।
এইসব ফেইলা বাবা কই যাইতে চাস?
ওখানে কি বকফুল পাবি, লাউডগা, গন্ধরাজ লেবু?

কতদিন, কত কাল কেটেছে তারপর
আমি আজও পড়ে আছি সুদূর প্রবাসে।
দাদার চিঠিতে জানি, তুমি শয্যাশায়ী— রুদ্ধবাক,
মাঝে-মধ্যে চোখ খুলে চাও
কাকে যেন খোঁজে সেই নিঃশব্দ চাহনি!

বাবা, আমি শিগগিরই ফিরে আসব
ফিরে আসব তোমার
সুশীতল বটের ছায়ায়।
তুমি ততদিন বেঁচে থেকো
তুমি বেঁচে থেকো।

কাল রাতে

শহর থেকে কতজনা আসে। আমার ঘরের দাওয়ায়
কাটালিচাঁপার গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ভুবন, তোমার
ফসলের মাঠ কি আশ্চর্য ছবি। তোমার সরষে খেতের হলুদ ফুলেরা
যেন ফর্সা মেয়ের কানের সোনার দুল। ভুবন, সাধ
হয় তোমার কল্‌মিলতার ঝোঁপে জলফড়িংয়ের
নাচ দেখে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিই। ভুবন, তোমার
জীবন ভারি সুন্দর।

আমি অবাক হয়ে ভাবি, সত্যি, আমিও একদিন
কাটালিচাঁপার গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, অমনি
মুগ্ধ চোখে আমার জীবনকে দেখব!

কাল রাতে আমি দেখেছি! পূর্ণিমার জোছনায়
যখন চরাচর ফুটফুট করছে, তখন আমি খেতের আলে
টুনটুনির মতো লাফিয়ে বেড়িয়েছি।

তারপর হঠাৎ দেখলুম, আমার সুন্দর পৃথিবী
দাউদাউ আগুনে জ্বলে গেল, আমার সুন্দর
পৃথিবী দাউদাউ আগুনে জ্বলে গেল।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

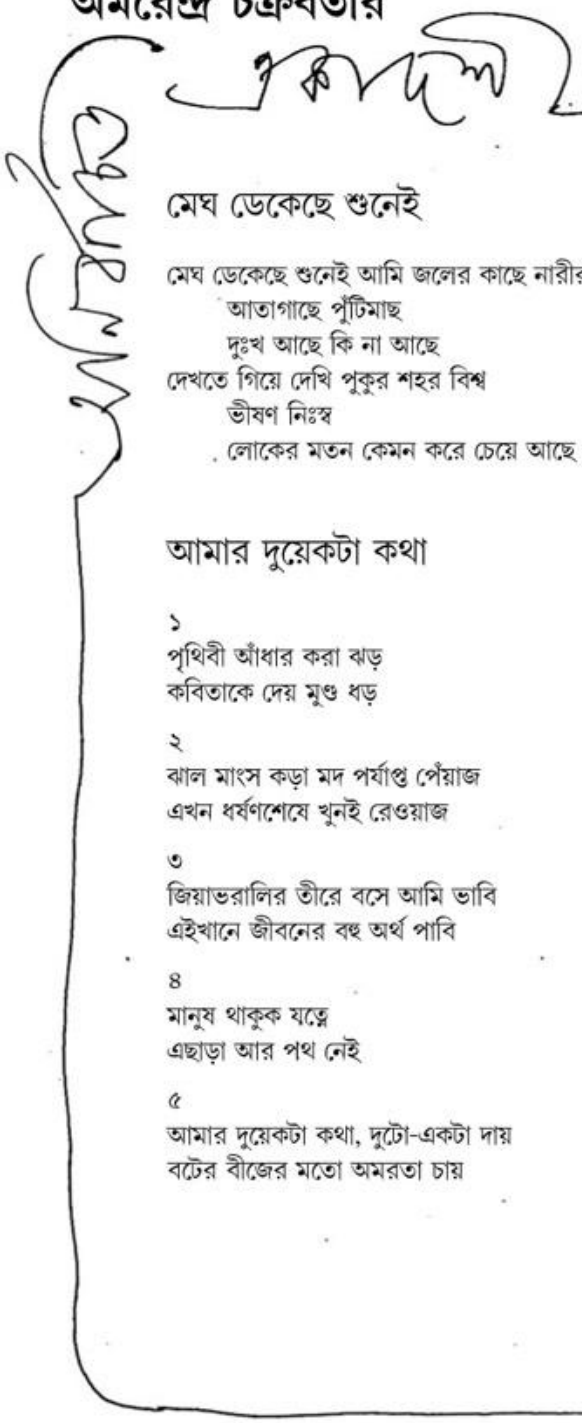

মেঘ ডেকেছে শুনেই

মেঘ ডেকেছে শুনেই আমি জলের কাছে নারীর কাছে
আতাগাছে পুঁটিমাছ
দুঃখ আছে কি না আছে
দেখতে গিয়ে দেখি পুকুর শহর বিশ্ব
ভীষণ নিঃস্ব
লোকের মতন কেমন করে চেয়ে আছে

আমার দুয়েকটা কথা

১
পৃথিবী আঁধার করা ঝড়
কবিতাকে দেয় মুণ্ড ধড়

২
ঝাল মাংস কড়া মদ পর্যাপ্ত পেঁয়াজ
এখন ধর্ষণশেষে খুনই রেওয়াজ

৩
জিয়াভরালির তীরে বসে আমি ভাবি
এইখানে জীবনের বহু অর্থ পাবি

৪
মানুষ থাকুক যত্নে
এছাড়া আর পথ নেই

৫
আমার দুয়েকটা কথা, দুটো-একটা দায়
বটের বীজের মতো অমরতা চায়

স্নেহ

টলোমলো পা-দুটি যেন ঠিকঠাক হাঁটতে শেখে, দেখো।
আমি তো বাইরের কাজে সারাদিন ঘুরি
মানুষ বেঠিকভাবে হাঁটছে দেখলে ভয় হয়।

বড়োই দুশ্চিন্তা হয়, দেখো—
এখন যা টলোমলো
তা যেন ভবিষ্যতে অন্যকে মাড়িয়ে চলে না যায়।
কীটনাশক বিষ দেওয়া শাকসবজি, ফল
ওকে যেন ভুলেও দিয়ো না।

জগৎসংসার

আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদি
আপনারা কি এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে ভাবেন—
আহারে ছেলেটা! ইচ্ছে করে, মাটির ঢেলার মতো
গুঁড়িয়ে দিই জগৎসংসার?

আপনারা তা ভাবেন না।
আপনারা যা ভাবেন
তাতে
ইচ্ছে করে নিজের দু'হাতে
মাটির ঢেলার মতো গুঁড়িয়ে দিই জগৎসংসার!

আমার কী নাম

ঘর বাড়ি মাঠ আকাশ পাতাল বিচারসভার রুক্ষ চাতাল
প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করে, কী নাম?
চারদিকে কূট লৌহজটিল বন্ধ জানলা দুয়ারে খিল
সব অপমান মাথায় তুলে নিলাম;
একলা নিরুত্তরে থাকি চাদরে মুখ শরীর ঢাকি
সময় হলে বলব আমার কী নাম।

পাহাড়ি রাস্তা

কত দূর থেকে চেঁচালে তোমার তৃণ নড়ে ওঠে, পাহাড়ি রাস্তা?
কত দূরে গেলে সখ্য নিবিড় হতে পারে বলো, পাহাড়ি রাস্তা?
বাড়াভাত ফেলে দরজা খুলেছি, তুমিও খোলো হে, পাহাড়ি রাস্তা!
দূরত্ব থেকে কত দূরে গেলে মানুষ ঘুমোয়, পাহাড়ি রাস্তা?
আমি যত যাই, তুমি তত যাও, আর কত যাবে, পাহাড়ি রাস্তা?
দূরত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তোমায় মানায়, পাহাড়ি রাস্তা।

অগ্নি

নিরক্ষর অগ্নি, তোকে কী করে লেখার কথা ভাবি!
মূক ও বধির, তুই আর কত পৃথিবী পোড়াবি?
দেখা তোর আদি শিখা, জ্যোৎস্নাজন্ম, রামধনু রূপের আদল
সন্তানের চক্ষে তোকে রেখে যাবো— সন্তানের চোখের কাজল।

কাল স্বপ্নের মধ্যে

কাল স্বপ্নের মধ্যে আমার খুব অহংকার হয়েছিল
এমনিতে সাইকেলে হেডলাইট ছিল না বলে পুলিশ আমাকে সারারাত
লকআপে রেখেছে কতদিন
নিজের বাড়ি ছিল না বলে আমি কখনো নারীর দিকে হাত বাড়াইনি
পায়ে জুতো ছিল না বলে আমার দু-পায়ে তাবৎ কীট-পতঙ্গ অলৌকিক উল্লাস করেছে
আমি কখনো বন্যার্ত-তহবিলে একটাকা চাঁদা দিতে পারিনি
ভিড়ের মধ্যে গলা উঁচিয়ে বলতে পারিনি— আমাদের এই সময়
আমার পছন্দ নয়!
অথচ কাল স্বপ্নের মধ্যে ময়দানে ঈদের নামাজের মতো হাজার-হাজার
কবিতা আমার সামনে নতজানু
আমি তাদের অভিবাদন গ্রহণ করিনি
আমি তাদের বলেছি
দ্যাখো, এসব আমার ভালো লাগছে না। আমি তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়
দিলুম, এর মধ্যে আমাদের যুগকে মমতাময়ী নারীর মতো করে দিতে হবে,
নাঁ-হলে আমি সব ভস্ম করে দেবো।
সাবধান! আমার নাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী!

ধরনা

যতক্ষণ ঝড়ের ভিতর থেকে অক্ষর না আসে
আগুনের মর্ম থেকে প্রদীপ না আসে
পথের প্রদাহ থেকে প্রতীক না আসে
মেঘের গর্জন থেকে গৌরব না আসে
বিদেহী বাতাস থেকে বিন্যাস না আসে
অষ্টপ্রহর থেকে আনন্দ না আসে
শব্দের সংস্থান থেকে সন্ন্যাস না আসে
ততক্ষণ বসে থাকবো শ্মশান-মশানে, সর্বনাশে
সাদা পাতা, তোমাদের পাশে।

কবিতা লিখতে লিখতে

এক দারুণ সন্ধ্যার খয়েরি ছায়ায় কবিতা লিখতে লিখতে আমি মুখ তুলে দেখেছিলাম,
কলকাতা, তোমার লক্ষ লক্ষ জানলায় হাড়িকাঠ পাতা।
সন্ধ্যার ছায়ায় এক দারুণ খয়েরি কবিতা লিখতে লিখতে,
কলকাতা, তোমার জানলায়-পাতা হাড়িকাঠ তুলে আমি লক্ষ লক্ষ মুখ দেখেছিলাম।
কলকাতা, তোমার লক্ষ লক্ষ ছায়ায় এক দারুণ সন্ধ্যার কবিতা লিখতে লিখতে
খয়েরি হাড়িকাঠ-পাতা জানলায় আমি মুখ তুলে দেখেছিলাম।
সন্ধ্যার লক্ষ লক্ষ খয়েরি মুখ তুলে, কবিতা, তোমার দারুণ ছায়ায় লিখতে লিখতে
আমি জানলায় দেখেছিলাম হাড়িকাঠ-পাতা এক কলকাতা।
লক্ষ লক্ষ সন্ধ্যার হাড়িকাঠ-পাতা খয়েরি ছায়ায়, কলকাতা,
তোমার দারুণ জানলায় কবিতা লিখতে লিখতে আমি এক মুখ দেখেছিলাম।
এক হাড়িকাঠ-পাতা জানলায় লিখতে লিখতে, খয়েরি কলকাতা,
সন্ধ্যার ছায়ায় তোমার দারুণ মুখ তুলে আমি লক্ষ লক্ষ কবিতা দেখেছিলাম।
হাড়িকাঠ-পাতা এক সন্ধ্যার কবিতা লিখতে লিখতে খয়েরি ছায়ায় মুখ তুলে
আমি দেখেছিলাম দারুণ কলকাতা।
তোমার জানলায় আমি, সন্ধ্যার কলকাতা, এক কবিতা দেখেছিলাম।
আমি তোমার মুখ দেখেছিলাম সন্ধ্যার খয়েরি ছায়ায়।
তোমার খয়েরি ছায়ায় আমি মুখ দেখেছিলাম।
তোমার সন্ধ্যার খয়েরি তুলে আমি দেখেছিলাম।
ছায়ায় তোমার মুখ আমি খয়েরি দেখেছিলাম।
খয়েরি দেখতে দেখতে প্রবল বৃষ্টি আর বাতাসে শহর তোলপাড় করে আমি
একটু আগুন খুঁজেছিলাম।
প্রবল আগুন তোলপাড় করে আমি বাতাসে একটু বৃষ্টি আর শহর খুঁজেছিলাম।
প্রবল আগুনবৃষ্টি আর-একটু তোলপাড় করে আমি শহর খুঁজেছিলাম বাতাসে।
আগুন প্রবল করে শহর আর বাতাসে আমি তোলপাড় বৃষ্টি খুঁজেছিলাম।
আর বাতাসে একটু আগুন করে আমি বৃষ্টি তোলপাড় শহর খুঁজেছিলাম।
আমি শহর তোলপাড় করে বাতাসে আর-একটু আগুন খুঁজেছিলাম।
আমি আগুন তোলপাড় করে খুঁজেছিলাম।
আমি আগুন তোলপাড় শহর খুঁজেছিলাম।
শহর, তুমি আমাকে কিছু দাওনি, অন্তত কবিতা দাও, কবিতা সঙ্গীত এবং
প্রকৃত আক্রোশ।
কবিতা, তুমি আমাকে কিছু দাওনি, অন্তত সঙ্গীত দাও, সঙ্গীত আক্রোশ
এবং প্রকৃত শহর।
সঙ্গীত, তুমি আমাকে কিছু দাওনি, অন্তত আক্রোশ দাও, আক্রোশ শহর
এবং প্রকৃত কবিতা।
আক্রোশ, তুমি আমাকে কিছু দাওনি, অন্তত কবিতা দাও, কবিতা সঙ্গীত
এবং প্রকৃত শহর।
আমাকে প্রকৃত কিছু দাওনি, অন্তত কবিতা, তুমি দাও।

লোকজীবন

ওই তো ঘুমের মতো নদী
ওই তো অনিদ্রাসম চাঁদ
ওই তো স্বজনহারা শোক
দলবদ্ধ মিথ্যাচারী লোক

ওই তো কী শূন্য নিরবধি
ওই তো স্বপ্নমাখা ফাঁদ
ওই তো সন্ত্রাস পাওয়া লোক
গৃহস্থের তবু খোকা হোক

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

স্টক এক্সচেঞ্জ/লায়ন্স রেঞ্জ

...কিন্তু আমরা এক পাও এদিক ওদিক
নড়ছি না, যেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকাই
আমাদের নিরাপত্তা, এবং তা সম্ভব। আমরা গির্জার গম্বুজগুলির
এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে
বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে
এক সময় ঈশ্বরের মহিমাকে জানতে পারছি...

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'উলঙ্গের স্বদেশ' কবিতাটি লেখা এই উত্তপ্ত সময়ে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা ও তার অসহায়তাকে নিয়ে। কবিতার শুরু কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে, 'শ্রমিকদের কিছুই হারানোর নেই, তার শৃঙ্খল ছাড়া', সেই নিহিতার্থ অবলম্বন করেই কবি প্রকাশ করেছেন হেরে যাওয়া মানুষদের ঘোলাটে চোখের আর্তি, অন্তরে জমে থাকা হাড় হিম করা শঙ্কা:

এক অদ্ভুত মাটির ওপর
আমরা দাঁড়িয়ে আছি,
অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য
প্রাণপণ চেষ্টা করছি।

বেঁচে থাকার এই প্রবল প্রয়াসের মধ্যে তিনি প্রত্যয় খুঁজছেন গির্জার গম্বুজগুলি ও স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে।

কবিতাটি লেখা উনিশশো আটষট্টিতে, তখনও কলকাতায় আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলতে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস। কবি তাই গির্জার উঁচু গম্বুজ আর স্টক এক্সচেঞ্জের স্তম্ভকেই তাঁর প্রত্যাশার প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতীক হিসেবে স্টক এক্সচেঞ্জকে ভাবা, বহন করে এক অন্য অর্থ। সেই স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পেরিয়ে রাত পর্যন্ত সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত দৃশ্যের। লায়ন'স রেঞ্জ আর স্টক এক্সচেঞ্জ যেন একে অপরের পরিপূরক। একটি নাম বললেই অন্য নামটি ঘাই মারে মগজে। স্টক এক্সচেঞ্জে পৌঁছতে হলে পা দিতেই হবে লায়ন'স রেঞ্জে।

সেই লায়ন'স রেঞ্জের স্টক-এক্সচেঞ্জে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সবাই দেখেছেন সেই অবাক-করা দৃশ্যটি। একটি চক মিলান জাহাজ-প্যাটার্নের অট্টালিকার প্রতি তলায় অসংখ্য গরাদবিহীন জানালার মতো। প্রতি জানালায় মুণ্ড ঝুঁকিয়ে বসে আছে নানা চেহারার লোক, সারি সারি সেই মুণ্ডের দৃশ্য ভারি মজাদার, তারা এক-একবার ভিতরে চোখ রাখছে, কী যেন দেখে বাইরে অপেক্ষমাণ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কী যেন ঘোষণা করছে চেঁচিয়ে। কী থাকে সেই চেঁচানিতে কে জানে, অমনি নীচে

অপেক্ষমাণ ভিড়ের মুণ্ডগুলো কখনও চিৎকার করে, কখনও হাতের আঙুল উঁচিয়ে জবাব দিচ্ছে সেই ঘোষণার। যেন তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে এক ধরনের কোড ল্যাঙ্গুয়েজে। উপরের মুণ্ডগুলি ও নীচের মুণ্ডগুলি এভাবেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। চেঁচানি ফলোড বাই হাত-নাড়া। অজস্র মানুষের সমবেত চিৎকারে গোটা লায়ন'স রেঞ্জে সারাক্ষণ একটা গমগম আওয়াজ। শুধু জানা আছে এই প্রলয়ংকর শব্দের মধ্যে নাকি ঘটে চলেছে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনের অংশে তিনতলায় দাঁড়িয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের এই গমগম করা দৃশ্য বহুবার দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারিনি মুণ্ডগুলো কী বলছে, আর নীচের মুণ্ডগুলোই বা কী উত্তর দিচ্ছে! দু-একদিন রাইটার্স থেকে নীচে নেমে পায়ে-পায়ে দেখতে গিয়েছি লায়ন'স রেঞ্জের এই বিচিত্র কাণ্ডকারখানা। ক্রমে বুঝেছি আমরা আদার ব্যাপারী, বিশাল জাহাজের কর্মকাণ্ড অনুধাবন করা আমাদের কম্মো নয়।

কিন্তু এই অট্টালিকাগুলির জন্মরহস্য জানার চেষ্টা তো করাই যায়।

সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করতে ইংল্যান্ড থেকে পৌঁছে গিয়েছেন প্রচুর লালমুখো যুবক। সদ্য ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন, ভারত সম্পর্কে নানা পল্লবিত কাহিনি শুনে এসেছেন নিজের দেশে। নিশ্চয় ভালোটা শুনেছেন কম, খারাপই বেশি। কিন্তু এ-তথ্য পৌঁছে গিয়েছে সে-দেশে যে, এখানে এলে খুব দ্রুত ধনী হওয়া সম্ভব। অতএব কোম্পানির আমন্ত্রণে নব্য যুবকরা কেউ কৌতূহলী হয়ে, কেউবা বেকারত্ব ঘোচাতে, কেউ পরিস্থিতির চাপে পড়ে অনিচ্ছায়, কেউ বাবা-মায়ের চাপে বাধ্য হয়ে এসে ভিড় করতে শুরু করলেন এ-দেশে। যোগ দিলেন কোম্পানির কেরানির কাজে।

প্রচুর ভেকেন্সি, নব্য যুবকরা চাকরি করতে এলেন বটে, কিন্তু তাদের মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই নেই এ-দেশে!

লালদিঘির উত্তর দিকে পুরো জায়গাটা তখন ফাঁকা। কিছু অংশে মাটির ঘর ছিল যেখানে বাস করতেন কোম্পানির

রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনের অংশে তিনতলায় দাঁড়িয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের এই গমগম করা দৃশ্য বহুবার দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারিনি মুণ্ডগুলো কী বলছে, আর নীচের মুণ্ডগুলোই বা কী উত্তর দিচ্ছে! ক্রমে বুঝেছি আমরা আদার ব্যাপারী, বিশাল জাহাজের কর্মকাণ্ড অনুধাবন করা আমাদের কম্মো নয়।

লোকজন। সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে কলকাতার কালেক্টর তখন জায়গাটা লিজ দিয়েছিলেন টমাস লায়ন নামে এক স্থপতিকে। মোট ষোলো বিঘা সতেরো কাঠা আট ছটাক জমি নিয়ে শুরু হল অট্টালিকা নির্মাণ। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে নির্মিত হল দীর্ঘাকার বাড়িটি। প্রথমে নির্মিত হয়েছিল মোট উনিশটি একতলা বাড়ি যেগুলি আলাদা-আলাদা গঠনের। সেই ঘরগুলিতে এসে ভিড় জমাতে শুরু করলেন নব্য ইংরেজ সমাজ।

সব মিলিয়ে অনেক ঘর, অনেক থাকার জায়গা। কেরানিদের জন্য তৈরি এই বাড়িতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন শয়ে শয়ে লালমুখো যুবকের দল। দুপুরে কলম পেষা, বাকি সময় হল্লাগোল্লা করে দিন গুজরান করা। একটি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে তাঁরা থাকতেন এই ঘরগুলিতে। এইসব ইংরেজ কেরানিদের বলা হত রাইটার, তাই তাদের বসবাসের বাড়িগুলির নাম হয়ে গেল রাইটার্স বিল্ডিংস।

কিন্তু তাতেও সব কেরানির থাকার জায়গা হল না, তাই পরবর্তীকালে টমাস লায়নকে আবার অনুরোধ করা হল আরও কয়েকটি বাড়ি তৈরি করে দিতে। রাইটার্স বিল্ডিংসের উত্তরদিকের ফাঁকা জমিটিতে শুরু হল নতুন নির্মাণ। নতুন বাড়িগুলি এমনভাবে গায়ে গা লাগিয়ে গঠন করা হল যেন বেশি-বেশি কেরানির স্থানসংকুলান হয় তার ভিতর।

এ-বাড়িতে একটু ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করতে হত রাইটারবাবুদের। তখন কে জানত এই অদ্ভুত গঠনের বাড়িটিই পরে ব্যবহৃত হবে স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে। সারিবদ্ধ (বা রেঞ্জ) এই বাড়িগুলিতে যাওয়ার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে একটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেই রাস্তার নাম লায়ন সাহেবের নাম অনুসারে রাখা হল লায়ন'স রেঞ্জ।

বাড়িগুলির নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর জমিটির লিজের মেয়াদ শেষ হয় টমাস লায়নের, রাইটারদের কাছ থেকে তিনি বাড়িভাড়া পেতেন প্রতিমাসে। কালক্রমে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এই সৌধগুলির মালিকানা তাঁকে দেওয়া হবে না, তাই সরকারের কাছে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন বাড়িগুলি হস্তান্তর করতে।

কিন্তু কে নেবেন এই বাড়িগুলি! ওয়ারেন হেস্টিংসের অতি ঘনিষ্ঠজন ছিলেন বারওয়েল সাহেব। তিনি এ-দেশে উচ্চ পদে কর্মরত থেকে তিরিশ বছর পর অবসর নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজ বাসভূমিতে।

সতেরোশো উননব্বইয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস সামান্য অর্থের বিনিময়ে একটি দলিল করে এই বাড়িগুলি বিক্রি করে দিলেন বারওয়েল সাহেবকে।

বারওয়েল সাহেব বাড়িগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠন করলেন একটি ট্রাস্টি বোর্ড যার অন্যতম সদস্য ছিলেন চিফ জাস্টিস স্যার এলাইজা ইম্পে।

অতঃপর যে-বিল্ডিং-এর যা বরাত! প্রথমে বিল্ডিংটি সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘকাল, অন্তত দু-হাজার তেরোর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় বিল্ডিংটি হয়ে গেল শেয়ার লেনদেনের প্রধান ক্ষেত্র।

লায়ন'স রেঞ্জের উত্তরদিকে গড়ে উঠল নতুন চিনাবাজার। অনেক পরে গড়ে উঠেছিল ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস।

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের
ছেলেবেলা
পত্রিকাস্টলে বা
সংবাদপত্র-বিক্রেতার
কাছেও পাওয়া যাবে।

ক য়ে ক টি চি ঠি

আলোক সরকার যখন বলেন

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার অক্টোবর ২০১৩ সংখ্যায় 'কবিতার পাতা' বিভাগে, কবি আলোক সরকার যখন বলেন কবিতার একমাত্র লক্ষ্য 'সম্পূর্ণতার দিকে যাওয়া, সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা' এবং এর অতিরিক্ত কিছু নয় অর্থাৎ, কবিতার কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই এবং যখনই সে কবিতা হয়ে উঠল, তখনই তার অবসান। তখন তা এক অবিসম্বাদী তত্ত্বকথা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার তিনি যখন বলেন, 'বাস্তব অভিজ্ঞতায় কবির প্রাথমিক অভীপ্সা অন্তত কিছু বলার দিকেই' সে কথাও এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু কবি যখন কবিতার নির্মাণ ও কবিতার ব্যবহারের সম্পর্ক সম্বন্ধে চুপ করে থাকেন মন বেদনার্ত হয়। মহাকবি বলেছেন, 'শব্দে শব্দে বিয়া দেয় সেই কি সে যমদমী'

—অতএব কালজয়ী কবিকে সার্থক কবিতা নির্মাণে তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রেরণাকে সঙ্গে নিতে হয়। শুধু নির্মাণকর্ম সম্পাদনে কখনওই কবিতা সৃষ্টি হয় না, তার জন্য আরও কিছু লাগে। কবিরই একটি কবিতা থেকে দেখা যাক সে বস্তুটি কী: কবিতার নাম— বাবা কাজ করছে (কাব্যগ্রন্থ 'ঘাস রঙের আলো')

প্রথম কিশোর জানলায় দাঁড়িয়ে/ওই তার বাবা/বাগানে কাজ করছে মুখ নিচু
কাল আবার অনেক ফুল পাওয়া যাবে।/ হয়তো সেই ফুলটাও পাওয়া যাবে/যার সবুজ পাঁপড়ির মাথার দিকটা লাল,/আর মাঝ খানটা/চাপা সোনালি রঙের
নিস্তব্ধ/সেই ফুল হাতে নিলে/অনেক অনেক দূর দেখা যায়।/ সে অনেক বুঝেছে/অনেক অনেক দূর দেখা যায়।
বাবা কাজ করছে। কত কত দিন/কাজ করছে বাবা। সে জানে/তার বাবার সব কাজ ওই ফুলটার জন্যেই।
সে গলা উঁচু করে বলছে/কষ্ট হচ্ছে! বাবা তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব!/একটা ছাতা নিয়ে/ দৌড়ে গিয়ে মাথায় ধরবো তোমার বাবা?

এক চিরায়ত ছবি এখানে আঁকা আছে যা কোনও স্থান ও কালের নতি স্বীকার করে না। —এই কবিতা রচনাকালে কবি শুধু তার নির্মাণ ও সম্পূর্ণতার কথা ভাবেননি— কবিতার বক্তব্য বা বস্তুও স্পষ্টতই তাঁর মুঠোয় ধরা ছিল।

এই প্রসঙ্গে বলি, কবির বাছাই করা সাম্প্রতিক কবিতাগুলির অভিমুখ যেন অতীতচারী সেই তিরিশ বা ষাটের কাল। সংকোচ না করে স্বীকার করি 'মৃত্যু ফুল' কবিতাটির এক রকম মানে করেছি বটে কিন্তু পরাবাস্তবে ঢুকে গিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। 'কবিতা-পরিচয়' আবার বেঁচে উঠতে পারে না!

অন্যান্য বিভাগের মধ্যে 'শব্দবক্র' আমার খুব ভালো লাগে। গবেষকের জ্ঞাতার্থে এ প্রসঙ্গে জানাই যে গত সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর এক সভায় ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের বাংলা একাদেমির মহাপরিচালক ডঃ শামসুজ্জামান খান সংবাদ দিলেন যে তাঁরা প্রতিটি বাংলা শব্দ প্রথমে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এখন কী অর্থে ব্যবহৃত হয় তার এক অভিধান তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

রণধীরকুমার দে
গল্ফ গার্ডেন, কলকাতা-৭০০ ০৩৩

ক্ষণের আমি

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় ক্ষণকথক রচিত 'ক্ষণের বচন'-এ 'আমি আমি থেকে অমাবস্যার উদ্ভব' চমৎকার। কবিতায় 'আমি' শব্দটি দেখলে সাধারণত পীড়া বোধ করি আজকাল।

কালীকৃষ্ণ গুহ
সল্টলেক-৭০০ ১০৬

নির্মাণকথা প্রসঙ্গে

'কালের কষ্টিপাথর'-এর অক্টোবর সংখ্যায় শেখর বসু'র দুটি গল্পই অনেকটা পুরনো সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। উনি একসময় আমার প্রিয়তম লেখকদের অন্যতম ছিলেন। তখন অবশ্য উনি নিজেও বাংলা সাহিত্যের রাগি যুবকদের একজন। সাহিত্যের চেনা স্রোতের বাইরে বেরিয়ে আসার মতো বলিষ্ঠতা দেখিয়েছিলেন। মূলত তাঁর ও আরও কয়েকজনের লেখালেখির অভিঘাতে শাস্ত্রবিরোধী গল্পের আন্দোলন পরিপুষ্ট হয়েছিল। 'কালের কষ্টিপাথর'-এর এই সংখ্যায় শ্রীবসুর গল্পের সঙ্গে পেলাম তাঁর একটুকরো ব্যক্তিগত লেখাও। তার মধ্যে যেন সেই রাগি যুবককেও দেখতে পেলাম, যিনি অনায়াসে বলতে পারেন, 'ভালো লেখকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই খুব কম। সাহিত্যের ইতিহাস বলে, এই কমসংখ্যক ভালো লেখকদের প্রত্যেকেই স্রোতের বিরুদ্ধে পাড়ি দিয়েছিলেন।' কিন্তু তাঁর এই দুটি বাক্যে আবেগ ও অভিমান যতটা, মনন ততটা কাজ করছে বলে মনে হল না। আসলে লেখনির বয়স যখন কম, পাঠকের ফুসফুসেও যখন অনেক তরুণ অক্সিজেন, তখন জীবন ও পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়ন একভাবে হয়। কিন্তু লেখনি যত প্রবীণ হয়, পাঠক যত পুরনো হয়, তত মূল্যায়নটা আর তাৎক্ষণিক না থেকে মহাকালিক হয়ে পড়ে। তখন অনেক কিছুকেই যুগের হাওয়া বলে আমরা একপাশে সরিয়ে রাখি।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। যে সময়ে নিজের চারপাশ ও বেঁচে থাকার চিরাচরিত পদ্ধতিকে নস্যাৎ করার ঢেউ উঠেছিল, ছাঁচভাঙা গল্পও মানিয়ে গিয়েছিল সেই সময়ের সঙ্গে। তার সবই কালোত্তীর্ণ হয়নি। শ্রীবসু যাকে স্রোত বলেছেন তা প্রথমত মনে হয় গল্পের ছাঁচ, যা বিগতকালের অসংখ্য বাঙালি লেখকের হাতে পড়ে একটু একটু করে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বদলেছে এবং পাঠককে একটা নির্দিষ্ট গল্প স্পষ্ট করে বলার মতো পথ তৈরি করে দিয়েছে। এই পথেই আমাদের প্রথিতযশা লেখকরা তাঁদের গল্পকে গড়িয়ে দিয়েছেন— রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণ থেকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র থেকে বিমল কর। এঁদের অজস্র লেখা কালের মহাফেজখানার মণিমুক্তো। অথচ সেই ধারা থেকে যে স্রোতস্বিনী ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হল, তা দীর্ঘায়ু হল না কেন? শ্রীবসু স্ব-পক্ষে অনেক উদাহরণই দিয়েছেন, কিন্তু এই প্রশ্নটি নিয়ে কেবল একবার নাড়াচাড়া করার ইঙ্গিত দিয়েও দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টেছেন। ফলে অক্টোবর সংখ্যায় তাঁর 'গল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গ' সম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠতে পারেনি বলে মনে হয়েছে।

মার্কেজ, ফুয়েন্তেস, লোসা যে জাদু-বাস্তবতার খোঁজ দিয়েছিলেন তা কখনও নিজে মূল স্রোত হয়ে উঠতে পারেনি। মার্কেজ গোটা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন আশির দশকে। সেসময় নাগাদই নোবেল পুরস্কারও পান তিনি। মার্কেজ নতুন পথ সন্ধান করতে গিয়ে বরাবর কি

শাস্ত্রবিরোধী থেকেছেন? জাদু-বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে গিয়েছে, তার কারণ তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড'। কিন্তু 'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা', 'ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড' কিংবা সিমন বলিভারের জীবনীভিত্তিক 'দ্য জেনারেল ইন হিজ ল্যাবিরিন্থ' কেবল জাদু-বাস্তবতার অনুগামী কিন্তু নয়। 'ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড' তো মার্কেজের সাংবাদিক-সত্তার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। সেখানে তিনি গল্প বলার ধরন পাল্টেছেন কিন্তু তথাকথিত স্রোতের বাইরে গিয়েছেন কি? তাঁর ছোটগল্পের দিকে তাকান। একদিকে লিখছেন 'দ্য ওল্ড ম্যান উইথ ইনর্মাস উইংস' কিংবা 'আই সেল মাই ড্রিমজ'-এর মতো অন্য ধারার গল্প আবার পরমুহূর্তেই ফিরছেন 'আই অনলি কেম টু ইউজ দ্য ফোন' বা 'বন ভয়েজ মিস্টার প্রেসিডেন্ট'-এ বাস্তবতার পরিসরে। মার্কেজের কথা ছেড়ে দিন। নবতম প্রজন্মের জাপানি লেখক এবং বিশ্বেরও জনপ্রিয়তম হারুকি মুরাকামির একাধিক গল্পে আছে জাদু-বাস্তবতা। কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী লেখকের তকমা জোটেনি তাঁর। আসলে গল্পটাকে শেষপর্যন্ত গল্পই হতে হয়। গল্পের স্রোত একটাই, ডুব দেবার কায়দাটা কেবল লেখক ভেদে ভিন্ন। ঝুঁকি নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে একটা পথকে আঁকড়ে থাকাই যায়। কিন্তু সেতারে যে মীড়ের কাজ অনায়াস, গিটারের তারের কি তা ততটাই সহজাত? শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা একটা 'ফর্ম' বেছে নিয়ে গল্পটাকে তাতে ফেলেছেন। গল্পকে বলেননি, তোমার আকার-প্রকার তুমিই বেছে নাও হে। তাঁদের গল্পের ধারা যে আজ শুষ্ক তার অন্যতম কারণ হয়তো এটাই যে, অনেক কথা, অনেক ভাবনা বলার ক্ষমতা ও ইচ্ছে থাকলেও 'ফর্ম' তাঁদের তা বলতে দেয়নি।

ভুবন মিত্র
ঘোলা, সোদপুর

রান্নার ঠেক

নিয়মিত পড়ছি 'কালের কষ্টিপাথর'-এর বই-ঠেক বিভাগ। আর পাঁচটা পত্রিকায় বইয়ের নীরস রিভিউ থেকে একেবারে আলাদা। কেন না, কেবল বইয়ের ভালোমন্দের কথা না বলে, আপনারা বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বই ও তার চরিত্রদের সম্পর্কে আরও অনেক অজানা তথ্য মজলিসি ভঙ্গিতে লেখেন। পাঠক হিসেবে এগুলি পড়তে খুবই আনন্দ পাই। অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ত্রিধারায় তিন নারী, কেন্দ্রে কলকাতা' শীর্ষক লেখাটি অত্যন্ত ভালো লেগেছে। পুরনো কলকাতার বিস্মৃতপ্রায় এক সেলিব্রিটি গহরজানের সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারলাম। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালি না হয়েও বাঙালি শ্রোতার আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, আর নয়নাদেবী, যাঁকে নিয়ে লেখা বইটি সম্পর্কে ওই লেখাতেই আলোচনা করেছেন, তিনি বাঙালি ঘরের কন্যা হয়েও বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের কত কঠিন হার্ডল পেরিয়ে তবে এই জায়গায় ওঁদের আসতে হয়েছে, ভাবতে গেলে অবাক লাগে। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'বরেন্দ্র রন্ধন' নামে বইটি নিয়ে আলোচনা। আমাদের ছোটবেলার দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন এই লেখায়। পড়তে পড়তে উত্তর কলকাতায় আমাদের ভাড়াবাড়ির, যাকে বলা হত বাসা, সকালবেলার ছবিটা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ঘোরানো বারান্দা থেকে দেখা যেত উঠোন, কলতলা আর রান্নাঘর। একান্নবর্তী পরিবারে অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা। নটার সাইরেন বাজল। নীচ থেকে উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে আসা রান্নার গন্ধ। সেসব দিন বড় তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে।

অমিত ঘোষাল
টালিগঞ্জ

বক্র শব্দ, বাঁকা কথা

'শব্দবক্র' বিভাগটি খুবই ভালো লাগছে। আগে আমরা ফরাসি ভাষায় এমন ধাঁচের কাজ হতে দেখেছি। ফ্লবেয়ারের 'ডিকশনারি অব রিসিভড আইডিয়াস' অনেকটা অভিধানের আকারই নিয়েছিল। যদিও শব্দকে সেখানে বদলানো হয়নি। সমসাময়িক প্রেক্ষিত ধরে তার অর্থকেই কেবল একটু শ্লেষ ও বিদ্রূপ মিশিয়ে পেশ করা হয়। গত শতকের প্রথম দশকে বেরনো অ্যামব্রোজ বিয়ার্সের 'দ্য ডেভিলস্ ডিকশনারি'ও ইংরেজি ভাষায় অনুরূপ উল্লেখনীয় কাজ। কিন্তু সেখানেও শব্দের মূল রূপ পাল্টানো হয়নি। বরং তা ফ্লবেয়ারের ধাঁচকেই অনুসরণ করেছে।

আমাদের বাংলায় শব্দের এমন ভাব-ভাষাগত শ্লেষাত্মক বিনির্মাণের কাজ হয়েছে, তবে তুলনায় অল্প। ফ্লবেয়ারের অভিধানের একটি চমৎকার বঙ্গানুবাদ সম্ভবত পড়েছি চিন্ময় গুহ'র কলমে। হিমানীশ গোস্বামী তাঁর 'অভিধানইপানাই'-এ অসাধারণ কিছু উদাহরণ রেখে গেছেন। হিমানীশবাবু বাংলা ভাষার শব্দাবলি নিয়ে আজীবন সিরিয়াস চর্চা করেছেন। এক্ষুনি মনে পড়ছে, তাঁর একটি ছোটগল্পে পড়েছিলাম, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস যে-পাড়ায় থাকেন সে-পাড়ার নাম ঈশ্বর মিল লেন। পাড়ার দেয়ালে সাঁটা পাড়ার নামবাহী টিনের প্লেট দেখে হিমানীশবাবু ভাবতেন, মুদ্রণপ্রমাদেই হোক বা অন্য কোন কারণে, নামের শেষ দুটি শব্দ যদি একই মাত্রার নীচে চলে আসে, তাহলে নাস্তিক বিজ্ঞানীর আপন পাড়ার নাম দাঁড়াবে ঈশ্বর মিললেন। আরও ক'বছর বেঁচে থাকলে হিমানীশবাবু নিশ্চয়ই দেখে যেতেন, ঈশ্বর সত্যিই মিলেছেন, তবে কণা-অবতারে। তার নেপথ্যে ঈশ্বর মিল লেনের বাসিন্দার অবদান যথেষ্ট।

শব্দ নিয়ে খেলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আর একজন। তিনি, শিবরাম চক্রবর্তী। অব্যর্থ ছিল তাঁর 'পান'।

অনেকদিন পর আবার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাভাষায় শব্দ নিয়ে, শব্দের বক্রতাকে নিয়ে মেধাবি একটি লেখা সত্যিই মন ভরিয়ে দিচ্ছে। এখানে লেখক শব্দের ধ্বনিগত অবস্থান বজায় রেখে হালকা করে শব্দগুলোকেও ইষৎ পাল্টে দিচ্ছেন, সেটাও মোটের ওপর সার্থক। হয়ত এই ধারাবাহিক রচনা থেকেই একদিন বাংলাভাষার মূল স্রোতের অভিধানেও যুক্ত হবে নতুন কোনও শব্দ।

সুভাষরঞ্জন দত্ত
বিরাটি

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

বই-ঠিক

ভালোবাসা, সংঘাত, রসুনখেত

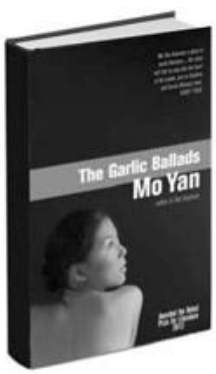

চিনা ঔপন্যাসিক মো ইয়ানের এই উপন্যাসটিকে অনেক সমালোচক তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের একটা চৌরাস্তা বলে মনে করেন, যেখান থেকে তাঁর লেখনী একটা মোড় নেয়। গতবছর সাহিত্যে নোবেল পান মো। সমালোচকদের ছিছিক্কার ওঠে। অন্যদিকে, চিনা সরকার সে দেশের অন্য নোবেল বিজেতাদের প্রতি তাদের যাবতীয় নাসিকাকুঞ্চন, কুণ্ঠা, জড়তা দূরে সরিয়ে

শি রো না মে ব ই

মো ইয়ান-এর

গার্লিক ব্যালাডস

রেখে নোবেল-জয়ী মো'কে উদার হস্তে বরণ করে নেয়। কারণ তাদের মতে মো-র লেখনী চিনা সরকারের আদর্শের, নীতিরেখার মাপে মাপে তৈরি। কারণ তিনি বরাবর সরকারের ভিতরের লোক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর চিনের যে-ছবি নাকি মো ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করেছে পার্টি কমরেডদের। এখানেই মো-র সমালোচকদের আপত্তি। যে লেখক কোনও নির্দিষ্ট শাসনপ্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত, তাকে নোবেলের মতো রাজনৈতিক গন্ধহীন পুরস্কার দেওয়াটা কতটা নীতিসম্মত!

ঘটনা যে, মো ইয়ান তাঁর যুবা-বয়স থেকে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, মাও জে দং-এর ভক্ত। বর্তমানে তিনি পার্টি-স্বীকৃত লেখকসঙ্ঘেরও সহ-সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, গতবছর ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় চিনা সরকারি দলের প্রতিনিধি হিসেবে গিয়ে সরকারি লাইন মেনেই সরকারের বিরাগভাজন কিংবা নির্বাসিত সাহিত্যিকদের সভা তিনি বয়কট করেছেন।

এসবের পর পাঠকের মনের ওপর একটা চাপ তৈরি হয় লেখককে খোলা মনে গ্রহণ করা নিয়ে। মো-র সৃষ্টির পুষ্করিণীতে গভীর ছায়া পড়েছে তাঁর জীবনের। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যিকসত্তা একাঙ্গী হয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক মো-র উপন্যাসকে হয়ত খোলা মনে গ্রহণ করা কঠিন, আবার ফুৎকারে তাঁকে উড়িয়ে দেওয়াও শক্ত।

গত শতকের আশির দশকের একেবারে শেষভাগে প্রকাশ পায় মো-র উপন্যাস 'দ্য গার্লিক ব্যালাডস'। ততদিনে মো-র জনপ্রিয়তম উপন্যাস 'রেড সরগম' হলিউডের চলচ্চিত্র হয়ে গিয়েছে। মো-র নাম জেনে গিয়েছে পশ্চিমি বিশ্ব। ১৯৮৮-এ চিনে বের হচ্ছে এই বই। আর ১৯৮৯-এর জুনেই তিয়েন আন মেন স্কোয়্যারে ঘটে যাবে সরকারি উদ্যোগে এক গণ-হত্যাকাণ্ড।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব-পরবর্তী চিনের মানুষের মনে বিষাদ জমেছে এটা টের পাচ্ছেন মো-ও। মো ইয়ান যেমন তাঁর পিতৃদত্ত নাম নয়, তেমনই এই উপন্যাসের পিতৃভূমি হিসাবে যে অঞ্চলকে তিনি বেছে নিলেন, তার গায়েও চড়ালেন ছদ্মবেশ। লাল পতাকা থাকল, থাকল চিনা আদলে সৈনিক, জেলখানা, কঠোর অনুশাসন, মাও-জে দং-এর নাম— কেবল জায়গাটা চিন না হয়ে হল প্যারাডাইস কাউন্টি নামে এক অলীক দেশ।

সে দেশেরই এক নাগরিক গাও ইয়াং-কে হঠাৎ একদিন সকালে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গাও ইয়াং-এর অপরাধ সে আরও অনেকের সঙ্গে সরকারি দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, ভাঙচুরে অংশ নিয়েছে। গাও ইয়াংকে যখন তার রসুনের খেত আর অন্ধ কন্যার সাহচর্য থেকে উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ, তখন বাড়িতে তার স্ত্রী তাদের সদ্যোজাতের যত্নে ব্যস্ত। বিহ্বল গাও ইয়াং-এর প্রশ্নের উত্তরে পুলিশকর্মীরা জানাচ্ছে, গাও ইয়াং একা নয়, সে যাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদের সকলকেই ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করবে সরকারের পুলিশবাহিনী।

গাও ইয়াংয়ের মতোই পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে, এমন আর একজন ব্যক্তি গাও মা। কিন্তু গাও মা পুলিশের কড়া নজর এড়িয়ে পালাল। তাকে জীবন্ত ধরা সম্ভব নয় বুঝে দূর থেকে গাও মা'কে লক্ষ করে গুলি চালাল পুলিশ। একটি উঁচু পাঁচিল পেরোচ্ছিল তখন গাও মা। পুলিশের গুলি তার গায়ে লাগল কিনা তা দেখা থেকে পাঠককে আটকে রাখল পাঁচিলের উচ্চতা। বরং মো তাঁর পাঠকদের নিয়ে ঢুকে পড়লেন এই কাহিনির অন্য এক গলিপথে।

সরকার থেকে চাষিদের উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছে এ বছর অনেক বেশি পরিমাণে রসুন চাষ করার জন্য। উৎপাদিত সব রসুন ন্যায্য দামে সরকারই কিনে নেবে। জমির মালিকরা তাই অন্য চাষ বাদ রেখে মাঠে রসুন লাগিয়েছেন। রসুনগুলো যদি হঠাৎ কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কারণে পচে না যায়, তাহলে এবছর সরকারি উদ্যোগের দরুন সকলেরই ঘরে কিছু বাড়তি অর্থ আসবে, পূরণ হবে দীর্ঘকাল মুলতুবি রাখা ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদ।

গাও মা'ও তার জমিতে রসুন লাগিয়েছে। প্রতিবেশীর তরুণী কন্যা জিঞ্জুর প্রেমে পড়েছে সে। যদিও জিঞ্জু জানে না সে-কথা। গাও মা আশায় আছে, রসুনের ফলন বেশি হলে সে জিঞ্জুকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। একটা গোটা দেশের সমস্ত তাপিত হৃদয়কে যেন ওষধিপ্রলেপ দিয়ে শান্ত করে রেখেছে রসুন।

জিঞ্জুর এদিকে বিয়ে ঠিক। ভাবী বর তার চেয়ে বেশ অনেকটাই বড়ো। কিন্তু কী করা! জিঞ্জুর বড়দা বিকলাঙ্গ। তার বিয়ের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। কিন্তু উপায় হয়ে গেল জিঞ্জুরই দৌলতে। প্যারাডাইস কাউন্টিতে বিয়ে-থার ক্ষেত্রে একরকম ভদ্রলোকের চুক্তি চালু। সেইরকম চুক্তি মেনেই জিঞ্জু একজনকে বিয়ে করবে এবং বিনিময়ে সেই লোকটির বোনের সঙ্গে বিয়ে হবে জিঞ্জুর বড়দার।

যদিও পাকেচক্রে জিঞ্জুর সঙ্গে গাও মা'র প্রেমটা জমে উঠল। যথারীতি তাতে মত নেই জিঞ্জুর বাবা-মা, দুই দাদার। জিঞ্জুর ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল। গাও মা'র ওপর চড়াও হল জিঞ্জুর দুই দাদা। কিন্তু না গাও মা, না জিঞ্জু, কেউই আর একজন অন্যজনকে

মো ইয়ান

ছেড়ে থাকতে রাজি না। শেষপর্যন্ত তারা একদিন পালাল। অন্ধকারে বহু রাস্তা পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল অন্য এক রাজ্যে। যখন তারা নিজেদের নিশ্চিন্ত ভাবছে, তখনই জিঞ্জুর দাদারা তাদের খুঁজে বের করল। গাও মা-কে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে গেল পাটখেতে। অনিচ্ছুক জিঞ্জুকে সঙ্গে করে নিয়ে এল বাড়ি। কিন্তু ততদিনে জিঞ্জুও অন্তঃসত্ত্বা।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে মো যেন একটা বুনো ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়েছেন তাকে। আর ঘোড়াটি কিছুতেই পোষ মানবে না বলে তার সওয়ারিকে কখনও সামনে হুমড়ি খাইয়ে ফেলছে, কখনও ঠেলছে পিছনে।

গাও মা-জিঞ্জুর প্রেমের সাব-প্লট থেকে আমরা ফিরে যাই জেলখানায়। সেলে ঢোকানোর আগে নির্মমভাবে গাও ইয়াংকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে। বন্দিরা তৃষ্ণার্ত। পুরুষ ও মহিলা রক্ষীরা সম্মিলিত ভাবে দুপুরের ভোজ সারছেন বিয়ার সহযোগে। যেভাবে নাটকের স্পটলাইট কোনও অংশকে অন্ধকার করে দিয়ে অন্য কোনও বৃত্তকে আঁকে, সেভাবেই মহিলাবন্দিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জিঞ্জুর মা 'ছোটকাকি'-কে। সরকারি দফতরে ভাঙচুরে যোগ দেওয়াতেই নিয়ে আসা হয়েছে ছোটকাকিকে। আমরা তার পায়ের কাছে জিঞ্জুকেও দেখতে পাই। পূর্ণ গর্ভবতী জিঞ্জু। সে এসেছে মা'কে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু ফিরছে হতাশ হয়ে। তার গর্ভস্থ সন্তান দিনের আলো দেখতে চাইছে। কিন্তু জিঞ্জু কিছুতেই তা হতে দেবে না। সে তার অনাগত সন্তানকে বলতে থাকে, বাছা ওই দ্যাখ রসুনের খেতগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে বিষাক্ত সরীসৃপের বাসা। এরপরও বাইরে আসতে চাস? তোর মতো ভ্রূণ ছিলাম যখন আমিও, বাইরে বেরনোর জন্য ছটফট করতাম। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হয়ে আমি কী পেয়েছি? কুকুরের খাবার, ষাঁড় কিংবা ঘোড়ার পরিশ্রম আর প্রহার। বল বাছা, এরপরও কি সূর্যের আলো দেখার মতো কঠিন হৃদয় আছে তোর? বাছা রে, তোর বাবা পুলিশের চোখে অপরাধী, তোর মায়ের পরিবার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার উপায় নেই, এরপরও আসতে চাস?

ভূমিষ্ঠ হতে উদ্‌গ্রীব ভ্রূণ বিষাদে চোখ বুজে ফেলে। সেই রাতেই আত্মহত্যা করে জিঞ্জু। এখানে কয়েকটি অসাধারণ চিত্রকল্প তৈরি করেন মো। যেখানে তার স্বপ্নে গাও মা দেখতে পাচ্ছে জিঞ্জুকে। জিঞ্জু বিদায় নিতে এসেছে। তার মুখটি সবুজ-হলুদ-লালে পরিবর্তিত হতে হতে শেষে ছাইরঙা হয়ে যায়। তাকে ছুঁতে হাত বাড়ায় গাও মা। তার হাত ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে জিঞ্জুর দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু অল্প দূরত্ব বাকি থাকতে হাতের বৃদ্ধিও থেমে যায় হঠাৎ। ছোঁয়া হয় না। পুলিশের নজর এড়িয়ে সেদিনই গভীর রাতে নিজের বাড়িতে ফিরে গাও মা দেখে জিঞ্জুর ঝুলন্ত স্ফীত অবয়ব। সে সব বুঝেও মৃতার সঙ্গে কথা বলে। তাদের অনাগত সন্তানের কথা বলে।

অন্যদিকে, রসুনচাষ নিয়ে একটা গোটা রাজ্যের লক্ষ মানুষের স্বপ্নও পূরণ হতে পারে না। দূরদুরান্ত থেকে চারটে টাউনশিপের হাজার হাজার চাষি তাদের উৎপাদিত রসুন গাধায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে সরকারের দফতরে বিক্রি করতে এসে শোনে, হিমঘর ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ। আর কোনও শস্য সেখানে রাখার জন্য কেনা যাবে না। যারা বহুকাল প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানাতেও ভুলে গেছেন, সেই চাষিরা এবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকারি দফতর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। আর, এই উগ্রতা কোনও আসন্ন প্রতিবিপ্লবের অঙ্গ কিনা তা নিয়ে ঘোরতর আশঙ্কায় থাকা প্রশাসন পরদিন থেকেই বিক্ষোভকারীদের

চিহ্নিত করে ধরপাকড় শুরু করে দেয়।

মো ইয়ানের উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে জেলখানার কদর্য ছবি। বড় আবেগ দিয়ে তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন আদালতে শুনানির দৃশ্যগুলিকেও। রসুন বিক্রি করতে গিয়েও বিফল হয়ে ফেরা ঝেং চেঙ্গিয়ানের ছেলে, সেনা-আকাদেমির মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট গবেষণাশাখার শিক্ষক তরুণ মিলিটারি অফিসার যেমন, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে কেবল মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষ ছিলেন সরকারি কর্মী। এখন তারা সংখ্যায় অনেক বেশি। কৃষিজীবী গরিব জনতাকে রাজস্ব, জরিমানা, ফি ইত্যাদি নানা শর্তে জেরবার করে তাদের বেতন জোগাড় করে সরকার। এরা সমাজে সামন্তবাদী পরজীবী। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের দূর করুন স্যার। প্যারাডাইস কাউন্টির এই ঘটনা কিন্তু একটা সংকেত। যে রাজনৈতিক দল বা সরকার মানুষের ভালো থাকার জন্য কাজ করবে না, মানুষ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

আশপাশ থেকে শ্লেষ আর বিদ্রূপ শোনা যায়, 'কমিউনিস্ট পার্টি পাল্টে গিয়েছে। যে পার্টিকে আমরা চিনতাম এটা সে পার্টি নয়।' সামগ্রিকভাবে আমলাআধ্যুষিত শাসনের আদর্শগত অবক্ষয় বুঝিয়ে দেন মো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো গাইডলাইন আর মাও-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী জমানার পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেন। জেলবন্দি রসুনচাষিদের বাইরে ডাক পড়ছে একে একে, তারা ভাবছে, এই বুঝি রক্ষীর গুলি তার পিঠ ফুঁড়ে চলে যায়! কিন্তু রক্ষীরা হাসতে হাসতে বলে, চিনের গুলি অত সস্তা নয় যে যার-তার জন্য খরচ করতে হবে।

ত্রিশতাধিক পাতার এই উপন্যাস মো ইয়ান অবশ্য শেষ করেন প্রেমিক গাও মা-র প্রসঙ্গ দিয়ে। জিঙ্গুর শেষকৃত্য থেকে ফেরার সময়ই সন্ধানী রক্ষীরা তাকে পাকড়াও করেছিল। তারপর থেকে আর পাঁচজন রসুনচাষির মতো সেও ছিল কারাগারে বন্দি। ১৯৮৮ সালের পয়লা জানুয়ারি বন্দিদের জেল-চত্বরের বাইরে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজ মানে, জমে থাকা বরফ চেঁছে ফেলা। মাথায় বরফের ভার নিয়ে রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে চেয়েছিল গাও মা।

পিছন থেকে ছুটে এসেছিল উষ্ণ আগ্নেয় বলয়। জমা বরফের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে অল্প ফাঁক হয়েছিল তার ঠোঁট। সে শুধু বলতে পারল, 'জিঙ্গু—'।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন বই

মনিরা বেগম-এর

বেগমের বাদশাহি রান্না

বাঙালি আগে বাড়িতে হাবড়ে ডাল-ভাত খেত। সঙ্গে থাকত ওল-কচু ভাতে, শাকচচ্চড়ি, ভাজাভুজি, মোচার ঘণ্ট, মাছের ঝাল, আম-আমড়া বা তেঁতুলের টক। সন্ধেবেলায় শখ করে দেদার চলত আলুর চপ, বেগুনি দিয়ে মুড়ি। বাজেট বেশি হলে চপ-কাটলেট, ডেভিল, মাটন কষা। কলকাতার সব পাড়াতেই চপ-কাটলেটের দোকান ছিল। মিত্র কাফে, অ্যালেন্স কিচেন, নিরঞ্জন আগার, দিলখুশা কেবিন, বসন্ত কেবিন, স্যাঙ্গুভেলি, চাচা'স হোটেলে গমগম করত লোক। চলত খাওয়া আর আড্ডা। বিরিয়ানি, মুরগ্ মসল্লম, মাটন চাঁপ জাতীয় মোগলাই খানা মিলত হাতে-গোনা দু-একটি জায়গায়। ক্বচিৎ সেগুলো চেখে দেখা হত। মনে একটু খচখচানি থাকত, না জানি যদি গোমাংস মিশিয়ে দেয়! হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল! পাড়ার চপ-কাটলেটের দোকানকে নক-আউট করে বাজারের দখল নিল এগ-চিকেন-মাটন রোলের স্টল, কিয়স্ক। একসময় কলকাতার দেয়ালে উৎকীর্ণ থাকত, 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। এখন সেখানে চাউমিন-চিলি চিকেন। তবে খুব বেশি জাঁকিয়ে বসার আগেই তাকে হঠিয়ে জায়গা নিল মাটন ও চিকেন বিরিয়ানি। এখন তো বিরিয়ানি বঙ্গীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গী! জাতীয় খাবার! পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে মহড়া নিয়ে বিরাজমান বিরিয়ানির দোকান। লাল কাপড় জড়ানো পেতলের বড়ো হাঁড়ি বা হান্ডি একটা থাকলেই হল। চালে হলুদ রং, ভেতরে একটু টুকরো মাংস পেয়েই ক্রেতা খুশি। খাওয়ার পর হাতটা চটচট করলে সোনায় সোহাগা। রমরম করে চলছে। হাতের কাছে দোকান পেয়ে কে আর দূরে সিরাজ, আমিনিয়া বা আর্সালান, জিশানে যায়! বড় দোকানের খরচটাও বড়। জয় হোক বিরিয়ানির! বাঙালি এখন বীরদর্পে মোগলাই চালাচ্ছে।

এখন টিভির প্রায় প্রতিটি চ্যানেলে রান্না শেখানোর অনুষ্ঠান। বেলা দেবীদের বইয়ের আশায় থাকতে হবে না, ইন্টারনেট খুললেই হাজির রেসিপি। ফলে বাড়িতে রান্না করাটা অনেকেরই সদ্য-গজানো শখ। কিন্তু মোগলাই রান্না করাটা সত্যিই মুখের কথা নয়। ঠিক কী কী লাগে যেমন জানতে হয়, জানতে হয় কখন, কীভাবে রান্নার রসায়ন গড়ে তুলতে হয়। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সঙ্গে যদি থাকে দীর্ঘদিনের রন্ধন-প্রশিক্ষক মনিরা বেগমের লেখা 'বেগমের বাদশাহি রান্না'। বাদশাহি রান্না মানে মোগলাই রান্না। বাদশা-বেগমের রসুইখানায় পাক হত। দোকানে বিরিয়ানির অর্ডার দেওয়া, টেবিলে প্রতীক্ষা, তারপর গোগ্রাসে গেলা। এইটুকুতেই আমরা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তারও হায়দরাবাদি, লখনউয়ি, মাদ্রাজি— নানা রকমফের আছে। স্বাদ-গন্ধ বা রান্নার পদ্ধতির ফেরে তাদের আবার কাচ্চি, মাটন, চিকেন, চিংড়ি ইত্যাদি পদ-বৈচিত্র্যও আছে। বিরিয়ানি মানেই মাংস নয়, তার নিরামিষ জাতিভাইরাও আছে। হরিনাম-সহ চাখতে পারেন। আছে সবজি বিরিয়ানিও। মনিরা খবর দিয়েছেন ১৫ রকমের লা জবাব শিক কাবাবের। সাধারণ রুটি-পরোটারই কত রকমফের— নান, খামিরা নান, কুলচা রুটি, রুমালি রুটি, খাস্তা পরোটা, জেলেবি পরোটা, আরবি পরোটা ইত্যাদি। এরকম বিরিয়ানি, পোলাও, রুটি-পরোটা, কাবাব, কোর্মা- কোফতা-হালিম থেকে হালুয়া-সেমাই-ফিরনি— মোগলাই খানার আদ্যোপান্ত বিবরণ, সেটা তৈরি করতে গেলে কী কী লাগবে, কীভাবে বানাতে হবে, তার বিস্তারিত নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে 'বেগমের বাদশাহি রান্না'য়।

বইটি মোগলাই রান্নার সাতসতেরোর নীরস বর্ণনায় ভরা ভাবলে ভুল হবে। সঙ্গে উপরি পাওনা ইতিহাস। 'লখনউয়ের চৌকে 'টুন্ডে কা কাবাব' নামে একশো বছরের পুরনো একটি নামি কাবাবের দোকান আছে। টুন্ডে মানে নুলো। কাবাবের সঙ্গে নুলোর কী সম্পর্ক? তা হলে শুনুন: বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এক নবাবের সব দাঁত পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাবাব খাবার শখ যায়নি। তিনি ঘোষণা করলেন, যিনি তাঁকে সবচেয়ে নরম কাবাব

খাওয়াতে পারবেন তাঁকে ইনাম দেবেন। হাজি মুরাদ আলি নামে এক নুলো বাবুর্চি চাহিদামতো কাবাব বানিয়ে তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলেন। ওই দোকানটিও হাজি মুরাদ খুলেছিলেন ১৯০৫ সালে। এই কাবাব তৈরির রহস্য শুধু মুরাদ পরিবারের কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' এরকম সব মোগলাই ঘরানার রান্নাগুলির ইতিহাস, সাহিত্য ও ধারাবাহিকতা সংযোজন করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান। যা বইটির মর্যাদা এবং পাঠসুখ বাড়িয়েছে বহুগুণ। তবে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কিন্তু আরও বিস্তার দাবি করে। তথ্যগুলি যে দুর্লভ তা তো নয়, তা হলে এত সংক্ষিপ্ত কেন! এ আক্ষেপ থেকেই যায়।

মনিরা সৈয়দ বাড়ির মেয়ে। ছোট থেকে এসব খাবার চেখেছেন, বুজুর্গদের তৈরি করতে দেখেছেন। মা, চাচি, নানি, দিদিদের সঙ্গে রান্নায় হাতও পাকিয়েছেন। সেই তালিম বিফলে যেতে দেননি। বেশ কিছুদিন ধরেই নিয়মিত রান্নার পাঠও দিচ্ছেন। এই দীর্ঘ চর্চা, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে মোগলাই রান্নার হালহদিশ জানানোর তিনি হকদার। এমনিতেই পড়তে পড়তে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। নাকে ভেসে আসে মোগলাই খানপানের সুগন্ধ। মনে হয় কোর্মা-কাবাবের রাশি ঢেকে দিচ্ছে।

শঙ্কর বসু

সম্পাদকের টিপ্পনি: ১৪৩ পাতার এই বইটিতে মনিরা বেগম পাঠককে মোগলাই রান্নার মহাঘ্রাণে মাতিয়ে দিয়েছেন। শুধু রন্ধনশিল্পী বা শিক্ষার্থীদেরই নয়, খাদ্যরসিকদেরও। সেইসঙ্গে পাতায় পাতায় শেষপাতের শাহি টুকরার মতো তথ্যটুকরোগুলি ক্ষুধাবর্ধকের কাজ করে। উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত দোকান, বিশেষ করে দিল্লির 'মোতিমহল' বা করিম'স-এর মতো ঐতিহাসিক ভোজনালয়ের সংক্ষিপ্ত ও প্রশংসনীয় উল্লেখ গোটা বইটিকেই সুস্বাদু করেছে। তবে, লখনউয়ের বড়ে মিঞার শতবর্ষপ্রাচীন ক্ষুদ্র দোকানের সুস্বাদু কাবাবের উল্লেখ এই বইয়ে আছে কিনা মনে পড়ছে না।

ফিরে পড়া বই

সলতাইকভ শ্চেদ্রিন-এর 'দি গোলোভলভস'

এই উপন্যাসে শ্চেদ্রিন এমন এক ভণ্ডের ছবি আঁকতে চেয়েছেন, যার অশুভ ক্রিয়াকলাপে গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। গোলোভলভ পরিবার এক বৃহৎ জমিদার পরিবার, যার একচ্ছত্র কর্ত্রী ছিলেন আরিনা পেত্রোভনা গোলোভলভ। এই পরিবারের প্রধান সমস্যা হল, এরা কেউ কাউকে বোঝে না। সবাই যে যার নিজেদের অহং, স্বার্থ ও লোভের খাঁচায় বন্দি। আরিনার বড় ছেলে স্তেপান ছিল এক প্রাণোচ্ছল মানুষ, একেবারেই এই পরিবারের স্বভাববিরোধী। সে যেন আশৈশব পরিবারে বহিরাগত, আবার তার অতিরিক্ত কথা ও আবেগের জন্য খানিকটা বিদূষক গোছেরও বটে। সে এমন এক মানুষ যার কোনও সংযম বা দূরদর্শিতা নেই, রয়েছে বাস্তববোধের নিতান্ত অভাব। জীবনে তাকে দাঁড় করানোর অনেক চেষ্টা করেছেন আরিনা পেত্রোভনা। কিন্তু সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এই উপন্যাসের শুরুতে জীবনের সমস্ত আশা নিভে গিয়েছে স্তেপানের, সেই অবস্থায় সে ফিরে আসে মায়ের কাছে। তখন তাকে একজন ভদ্রলোক বলে চিনে ওঠাই মুশকিল। দারিদ্র তাকে একেবারে বেহাল করে ছেড়েছে।

আরিনার আরও দুটি সন্তান রয়েছে। এরা হল পরফাইরি এবং পাভেল। পরফাইরি যেমনই ধূর্ত, পাভেল তেমনই নিষ্ক্রিয়। স্তেপানই একসময় পরফাইরির নাম দিয়েছিল, 'জুডাস।' আর তার কারণ হল, সে যা বলে, তা সবই মিথ্যে। তার কথার মধ্যে কখনও কোনও সত্য বা নিষ্ঠা থাকে না। তাই তার একটা কথাকেও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এসব মানুষই দ্রুত ক্ষমতার কাছাকাছি যায় এবং ক্ষমতাবানের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। পরফাইরিও তাই তার মা'র অতি প্রিয় এবং সর্বদাই মিষ্টভাষণে তার মাকে তুষ্ট রাখে। স্তেপান বুঝতে পারে তার প্রতি তার মা'র ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু সেই ঔদাসীন্য শেষপর্যন্ত ছাড়িয়ে যায় চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতাকেও। যে মানুষ নিজের রুটি নিজে জোগাড় করতে পারে না, তাকে মানুষ বলেই মনে করেন না আরিনা। বহু কষ্টে এই জমিদারিকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন তিনি। মা'র স্বার্থপরতা, লোভ স্তেপানকে পীড়া দেয়। তাকে একটা নোংরা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। খেতে দেওয়া হয় পচা মাংস। বাড়িতে সকলের খাওয়ার পর যা বেচে থাকে, সেইসব। সন্ধের পর তেলের অভাবে তার ঘরে কোনও আলো জ্বলে না। তাকে একটা বাতিও দেওয়া হয় না। সেই অন্ধকারে সে নিজের ঘরে শুধু পায়চারি করে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্ষুধা ছাড়া আর সব বোধ তার লুপ্ত হয়ে যায়। আর একটু খাদ্য পাওয়ার আশায় সে মুখিয়ে থাকে!

আর মা শুধু নিষ্ঠুরের মতো অর্থ সঞ্চয় করে যায়। স্তেপান খুব চায় নিজের পরিবারের একটা অংশ হয়ে উঠতে। কিন্তু কেউ তাকে সেই সুযোগ দেয় না। স্তেপানের ভাইয়েরা আসে, মায়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারে, স্তেপান তাদের অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। চোখের সামনে সে দেখতে পায় পরিবারের বিপুল অপচয়, কীভাবে ভালো ভালো খাদ্য নষ্ট হয়, অথচ তার কথা শোনার বা তার দিকে তাকানোর সময় তার মা'র নেই। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে মা আলোচনায় বসেন। মা স্তেপানকে আরও একটা সুযোগ দিতে চান, একথা স্পষ্ট করে জানান। কিন্তু প্রকৃতির মুক্তিতে স্তেপানের সেই নতুন নির্বাসনে আপত্তি জানায় ধূর্ত পরফাইরি। সে যুক্তি দেখায়, এতে পরিবারের আরও কিছু সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। মা এই যুক্তি মেনে নেন এবং স্তেপানের বন্দিত্ব আগের মতোই অব্যাহত থাকে। তার নিজের কিছুই নেই, কোথাও পৌঁছবার নেই। উপযুক্ত পোশাকের অভাবে ঠান্ডায় কাঁপতে থাকে, তবু তাকে একজোড়া বুট ও গরম কোট দেওয়া হয় না।

মা শুধু দেখে, ছেলে যাতে একদম না খেয়ে মারা না যায়। ওইটুকু ছাড়া ছেলের প্রতি আর কোনও দায়িত্ববোধ সে অনুভব করে না। এক সীমাহীন শূন্যতায় যা মৃত, প্রাণস্পন্দনহীন, তার মধ্যে স্তেপান নিমজ্জিত হতে থাকে।

গুরুতর অসুস্থ হয় সে। নিজে যে সুখের অবস্থায় আছেন, সেখানে বসে ছেলের দুর্দশার কথা চিন্তাও করতে পারেন না আরিনা। এভাবে স্তেপানকে পেটভাতায় রেখে তাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ক্রমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন আরিনা। একদিন সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং তাকে ধরে আনার পর দেখা যায় সে প্রায় অর্ধোন্মাদ এবং বোবা। ততোদিনে সে সমস্ত বোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার ভিতরে সবটাই ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। স্তেপান শেষপর্যন্ত মারা যায়, যদিও ছেলেকে প্রায় নিজের হাতে খুন করলেও সে ব্যাপারে কোনও বোধই তৈরি হয় না আরিনার মনে। বরং সে যে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়েছে, সেটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে।

পরের অধ্যায়েই দেখা যায়, যে-আরিনার ওই রকম প্রতাপ ছিল, সে এখন নিছকই তার ছোট ছেলে পাভেলের আশ্রিতা। জমিদারি দুই প্রিয় ছেলের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়ার পরই তার দুর্দশার শুরু। দশ বছর মাত্র কেটেছে, আর পারিবারিক ব্যাপারে কোনও মতামত দেওয়ার অধিকারই সে হারিয়েছে। দুই ছেলেই চাকরি ছেড়ে মায়ের অনুমতি ছাড়াই নিজেদের জমিদারিতে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। আরিনা প্রথমে পরফাইরির কাছেই থাকে। কারণ জমিদারির ভালো অংশটা সে-ই পেয়েছে আর এই নিয়েই পাভেলের রাগ। মা'র সঙ্গে সে কথাই বলতে চায় না। এমনিতেই তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়তা, তার ওপর অতিরিক্ত মদ্যপান তাকে ক্রমেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে থাকে। আর ভাই যত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তত সে ব্যাপারে খবরাখবর সংগ্রহ করে পরফাইরি তার গুপ্তচর উলিতার মাধ্যমে। কারণ ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে-ই পুরো জমিদারির বৈধ উত্তরাধিকারী। পরফাইরির কাছে কিছুদিন থাকার পরই আরিনা বুঝে যান, তার সমস্ত অধিকার ও কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছে। চরম অসম্মানিত আরিনা চলে আসতে বাধ্য হন ছোট ছেলে পাভেলের কাছে। চোখের সামনে দেখেন কীভাবে ব্যাপক চুরি-চামারি চলছে, অথচ সেদিকে পাভেলের কোনও খেয়ালই নেই। মাঝে মাঝে ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে আরিনার, কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে তিনি সংযত করেন। বিষণ্ণতায়, একাকীত্বে নিঃশব্দে তিনি কাঁদেন।

সারাজীবন যিনি 'পরিবার' ছাড়া অন্য কিছুই ভাবেননি, হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করেন, পরিবার বলতে তিনি যা ভেবেছেন, আসলে সে তা নয়! পাভেলের মৃত্যুর আগেই তার জমিদারিতে জুডাস এসে হাজির হয়, যদিও সে জানে পাভেল তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু পাভেলের অসুস্থতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গোটা পরিবারের কর্তৃত্ব সে নিজের হাতে তুলে নেয় এবং পাভেলের মৃত্যুর পর তার বৈধ উত্তরাধিকারী হয়ে বসে। আরিনা ঠিক করেন তাঁর অকালপ্রয়াত বড় মেয়ের দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে তিনি অবিলম্বে জমিদারির তৃতীয় ভাগে চলে যাবেন, যেখানে তার ওপর জুডাসের কোনও কর্তৃত্বই খাটবে না। এই জায়গাটা জমিদারির সবচেয়ে বিষণ্ণ ও অনুর্বর জায়গা,

সলতাইকভ শেচ্রিন

যেখানে থাকতে সারাজীবন আরিনা অপছন্দ করেছেন! কিন্তু তবু জুডাসের হাত থেকে বাঁচতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। জুডাসের একটা অভ্যাস, সে খুব ধীরে খায় আর সেইসময়ই যত পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এরকমই এক আলোচনার পর আরিনা জুডাসের হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে মৃত পাভেলের গৃহ ত্যাগ করেন।

এই ঘটনা আরিনার মতো সক্রিয় মানুষকে একটি নিষ্ক্রিয় ধ্বংসাবশেষে পরিণত করে। বড় মেয়ের দুই মেয়ে আনিনকা আর লুবিনকা ভাগ্যান্বেষণে নিজেদের জমিদারি ছেড়ে শহরে চলে যায়। একাকীত্ব ও আলস্য আরিনাকে ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দিতে থাকে। জীবন থেকে তিনি যত বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন, জীবনের প্রতি স্পৃহাও তাঁর ততই বেড়ে যেতে থাকে। তাঁর ইচ্ছাশক্তি যত কমে যেতে থাকে ভিক্ষাবৃত্তি তত বেড়ে যেতে থাকে। সবচেয়ে প্রবল হয়ে দাঁড়ায় ক্ষুধা। ভালো ভালো খাদ্যের স্বপ্ন নিরন্তর তাঁকে তাড়িত করে। আর একমাত্র জীবিত ছেলের কাছে একটু ভালো খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের জন্য তিনি নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। জুডাসের অজ্ঞতা, তুচ্ছতা, সততা ও নৈতিকতার অভাব, বাগাড়ম্বরতা সবই তিনি সহ্য করতে শুরু করলেন। ভণ্ডামি আবেগকে সংযত রাখে এবং মানুষকে ভদ্রসম্মত জীবনযাপনে সাহায্য করে। জুডাসের ক্ষেত্রেও তাই হয়। শুধু কথার স্রোতে মানুষকে সে বেসামাল করে দেয় এবং এই অবিরাম অর্থহীন কথা তার একটি শক্তিশালী অস্ত্র। জুডাসের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে তাদের আলাদা করা যায় না। লোকের মনে সে শুধুই বিরক্তি, ত্রাস ও অস্বস্তির উদ্রেক করে চলে।

জুডাসের জীবনও ক্রমেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। তাঁর একটি ছেলে ভলোদভা ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছে। সে ব্যাপারে জুডাস এতোই উদাসীন যে নিজের ছেলের মৃত্যুদিন (২৩ নভেম্বর) পর্যন্ত সে মনে রাখতে পারে না। আরিনা তাকে মনে করিয়ে দেয়। ছোট ছেলে পিটার তার বাবার কাছে মরিয়া হয়ে ফিরে আসে। সে জানায়, সে দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং সে অর্থ শোধ দিতে না পারলে তার জেল হয়ে যাবে, তার জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে জানে, তার বাবা কোনও কারণেই দুর্বল হওয়ার মানুষ নন। তাঁর আনন্দ, ঘৃণা, দুঃখ, ভালোবাসা, স্নেহ কিছুই নেই। এই দুনিয়া তার কাছে যেন একটা কফিনের মতোই। শুধু দিনরাত বসে অর্থের হিসেব করা ছাড়া আর কোনও প্রাণস্পন্দন তার মধ্যে নেই। আর সে প্রার্থনা করায় খুব মনোযোগী, যদিও সেই প্রার্থনা কোনও অনুভূতি থেকে আসে না, তার মধ্যে কোনও আলো জ্বালাতেও পারে না। বাধ্য হয়ে ছেলে বাবার কাছে প্রথমে ভিক্ষা করে, তারপর তার কঠোরতা দেখে তর্ক করে এবং শেষপর্যন্ত ভয়ও দেখায়। কিন্তু কোনও কিছুতেই ঘাবড়াবার পাত্র জুডাস নয়। একজন ক্ষুধার্থ মানুষের হাতে পাথর ঠুসে দেওয়ার মতোই নিজের ছেলের সঙ্গে সে আচরণ করে। ছেলের প্রতি তার এক উপদেশ, তোমার যেমন কাপড় ছিল, সেই অনুযায়ী পোশাক তৈরি করা উচিত ছিল! তুমি নিজেই তোমার শয্যা তৈরি করেছো, এবার ওতেই তোমায় শুতে হবে। ছেলে বুঝতে পারে এবং পিতার উদ্দেশে উচ্চারণও

আয়ারল্যান্ডের খ্যাতনামা নাট্যকার টম মার্ফির সাম্প্রতিকতম নাটক 'দ্য লাস্ট ডেজ অফ আ রিলাকট্যান্ট টাইর‍্যান্ট'-এ রয়েছে 'দ্য গোলোভলভ ফ্যামিলি'র ছায়া

করে, খুনি!

শুধু তাই নয়, সে আরও বলে, অপর ভাই ভলোদিয়াকে তুমিই খুন করেছো, সে তার মতো চলেছে, তুমি কোনও বাধা দাওনি। তারপর সে বিপদে পড়লে কোনও সাহায্যও করোনি। সে না খেতে পেয়ে মারা যায় আর সেই ব্যবস্থাই তুমি করেছিলে। আসলে তোমার যে-কোনও কথার দশ রকম অর্থ হতে পারে। তুমি কোন অর্থে বলেছো, সে কথা কেউ কীভাবে জানবে? এভাবেই শেচ্রিন একজন ভণ্ডের চরিত্র নিপুণভাবে আঁকতে থাকেন। বলা বাহুল্য, এসব উক্তি করার পর একমাত্র জীবিত ছেলেকে বিদায়ের ব্যবস্থা জুডাস ভালোভাবেই করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। পিটারকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানেই অসুস্থ হয়ে সে মারা যায়। আরিনা এই ঘটনায় সম্পূর্ণ বাক্যহারা হয়ে যান এবং শোক সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেন। ঠিক এই সময়ই সুন্দরী আনিনকা এসে হাজির হয় গোলোভলভে। তার সৌন্দর্যে এবং উন্নত স্তন দেখে তার মামা একেবারে মোহিত হয়ে যায়। আনিনকাকে ওখানেই রেখে দেওয়ার জন্য জুডাস পীড়াপীড়ি শুরু করে। আনিনকার দিকে সে তৈলাক্ত চোখে তাকিয়ে থাকে, তার হাঁটুতে দীর্ঘসময় হাত রাখে, সহজে সরাতে চায় না, তার বুকের দিকে চোখের পাশ দিয়ে তাকায়।

অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতিমান হওয়ার লোভেই জন্মভূমি ছেড়ে চলে গিয়েছিল দুই বোন। আনিনকা ছিল সেইসব প্রতিভাহীন গ্রাম্য অভিনেত্রীর মতো যাদের জীবনটা যেন সেই সরাইখানা, যার দরজায় যতদিন যৌবন আছে ততদিনই কড়া নাড়া যায়। উদ্দেশ্যহীন জীবনটায় যেন ময়লার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই জমেনি! এখানে সে বুঝতে পারে একজন অভিনেত্রীর শরীর ও আত্মা কোনওটাই তার নিজের নয়, দুটোই জনগণের সম্পত্তি হয়ে যায়। আনিনকা চলে যাওয়ার পর জুডাস বাড়ির পরিচারিকা ইউপ্রাক্সিয়ার সঙ্গে প্রণয় শুরু করে। যৌনতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ জুডাসের এবং ইউপ্রাক্সিয়া শেষপর্যন্ত একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। যদিও সবাই জানে, কোনও মানুষের প্রতি প্রণয় তো দূরের কথা, করুণা করাও জুডাসের পক্ষে সম্ভব নয়। ইউপ্রাক্সিয়াকে সে রেখেছে কারণ সে খুব ভালো সংসার চালাতে পারে। উলিতাও বুঝতে পারে, জুডাসের মতো মানুষের বিরুদ্ধে জেতা অসম্ভব কারণ সে যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে! উলিতার ওপরই দায়িত্ব পরে অবৈধ সন্তানটিকে কোনও অনাথ আশ্রমে পাচার করে দেওয়ার, যাতে জুডাসের ভাবমূর্তি বজায় থাকে। এইভাবে নিঃসঙ্গ জুডাস ইউপ্রাক্সিয়াকেও নিঃসঙ্গ করে দেয়। আর ফাদারের কাছে সন্তানটি জন্মানোর দায় পুরোপুরি ইউপ্রাক্সিয়ার প্রলোভনের কাছে নতিস্বীকারের ওপর চাপিয়ে দেয়। হাতের ময়লা মোছার মতো করে এব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

জুডাসের জীবন ক্রমেই আরও গভীর শূন্যতায় পর্যবসিত হতে থাকে। তার কাছের লোক যারা ছিল তারা সবাই হয় মৃত, নয় তাকে ছেড়ে গিয়েছে। মাতৃত্বের হতাশা ইউপ্রাক্সিয়াকে ক্রমেই জুডাসের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ করে তোলে। নিজের সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য যত সে মরিয়া হয়ে ওঠে, জুডাসের প্রতি তার রূঢ়তা তত বেড়ে যেতে থাকে। তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জুডাসের নানা ছলচাতুরি। সে বলে ওঠে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে একটি নেকড়েও নিজের সন্তানের প্রতি এত নিষ্ঠুর হয় না। জুডাস বাধ্য হয়ে এই রূঢ়তাকে মেনে নিত কারণ ইউপ্রাক্সিয়াকে ছাড়া তার সংসার চালানোর মতো কেউ নেই। ইউপ্রাক্সিয়াও বুঝে যায়, সে চলে যাওয়ার হুমকি দিলেই জুডাস ভয়ানকভাবে ভীত হয়ে পড়ে। এ ভয় সংসারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার ও একাকীত্বের। জুডাস এখন বেশিরভাগ সময়ই স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে, বাস্তব থেকে পালাতে চায়। সেই স্বপ্নের জগতেও সে যাদের ওপর রাগ, তাদের ওপর মনে মনে প্রতিশোধ নিতে থাকে। এই সময় তার মুখ বিকৃত হয়ে যায়, চোখ জ্বলতে থাকে। সে নিজেও বুঝতে পারে সারাদিন কাজের ভারে ক্লান্ত হয়ে থাকলেও আসলে সে কোনও কাজই করে না। জুডাসের উপস্থিতিতেই ইউপ্রাক্সিয়া অন্যান্য পরিচারকদের সঙ্গে প্রণয়লীলা শুরু করে। জুডাসের করার বা বলার মতো কিছুই থাকে না। পরিস্থিতি ক্রমেই যেন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।

এইসময়ই আনিনকা আবার গোলোভলভে ফিরে আসে। বিনোদনের জীবনে সহজে সে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। কিন্তু বোন লুবিনকাই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে নামায়। এর জন্য চড়া দাম দিতে হয় লুবিনকাকে। সে আত্মহত্যা করে। নিজেকে পণ্য করার চড়া দাম দিতে হয় আনিনকাকেও। জীবন তার নারীত্ব আর প্রাণশক্তি— দুটোকেই নিঙড়ে নেয়। সে আর জুডাস দু'জনেই সারারাত জেগে থাকে, মদ্যপান করে যায়, নিজেদের মনঃপীড়ায় দু'জনেই ছটফট করতে থাকে। স্তেপানের মতো আনিনকাও বুঝতে পারে, মৃত্যু ছাড়া গোলোভলভ থেকে তার আর পাওয়ার কিছুই নেই। জীবনের চাপে দুটি এমন মানুষ পিষ্ট হতে থাকে, যাদের চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়েছে, নৈতিকভাবে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে মন। এই সেই শূন্যতা, যা এই পরিবারের অনিবার্য নিয়তি। এ এমন পরিবার যেখানে সর্বদাই রুটির বদলে পাথর দেওয়া হয়েছে, পথ দেখানোর বদলে আঘাত করা হয়েছে। বন্ধুত্ব, উষ্ণতা ও ভালোবাসার বদলে শুধু অর্থের পাহাড় গড়ে তোলা আর স্বার্থের চরিতার্থতা, এই হল গোলোভলভ

পরিবারের বৈশিষ্ট্য!

এখানে বিবেক এমনভাবে তার সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা হারায় যা একজন মানুষকে সবসময় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ রাখে। দুটি একা মানুষ জীবনে ফেরার কোনও আশা ছাড়াই নিজেদের ভিতরে পীড়িত হতে থাকে। দীর্ঘ জীবনে জুডাস কখনও অনুমান করতে পারেনি যে তার ভিতরে কিছু একটা ক্ষয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, যদিও সে বেঁচে আছে! তাকে বোঝার ও করুণা করার কেউ নেই। ঔদাসীন্য আর ঘৃণা ছাড়া তার চারপাশে আর কিছুই নেই। এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে সে রয়েছে, যে নিজেও সমান একা এবং মৃত্যুপথযাত্রী। দুটি মানুষ, অথচ তাদের মধ্যে যোগাযোগের সব সূত্রই হারিয়ে গিয়েছে, দু'জনেই আহত, নিপীড়িত ও নিঃসঙ্গ! এই হল শেষপর্যন্ত জুডাসের জীবনের পরিণতি! বেঁচে থাকাটা তার কাছে এখন শুধু বেদনাদায়কই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সত্যের ওপর খুনির মতো অবিচার চালিয়ে গিয়েছে সে! আনিনকাও অনুভব করে তার সামনে সীমাহীন, ভয়ানক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। উপন্যাসটি শেষ দু'জনেরই মর্মান্তিক মৃত্যুতে। দু'জনেই প্রকৃতপক্ষে দু'ভাবে আত্মহত্যা করে নিজেদের জীবন শেষ করে দেয়। গোলোভলভ পরিবারের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায় এইভাবে।

এই উপন্যাসে মানুষের প্রতি মানুষের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা দেখাতে চেয়েছেন শেচড্রিন। প্রকৃতপক্ষে এ এমন এক ভণ্ডের জীবনকথা, যে আপাতভাবে নিজেকে সত্য ও ধর্মের ধ্বজাধারী বললেও, তার মিথ্যা, ছলচাতুরি, বাকচাতুর্য আর দ্বিচারিতার কোনও শেষ নেই। নিজের ভণ্ডামি দিয়ে সে একের পর এক জীবনকে ধ্বংস করে চলে। আর কী সেসব জীবন! তারা সবাই তার প্রিয়জন, কেউ মা, কেউ সন্তান, কেউ প্রেমিকা, কেউ ভাই! সে অন্ধের মতো স্বার্থসিদ্ধি করে চলে, নিজের ভণ্ডামিকে চরিতার্থ করে চলে এটা না ভেবেই যে এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়ায় আসলে সে নিজেই ক্ষয়ে যাচ্ছে, একা হয়ে যাচ্ছে, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ভণ্ডামির মধ্যে যে সর্বগ্রাসী আত্মঘাত রয়েছে, সেটাই শেচড্রিনের শ্লেষের বৈশিষ্ট্য! তিনি ভণ্ডকে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন, তাকে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখাবেন বলেই। এই মোক্ষম শ্লেষের জন্যই এক ভণ্ড ও তার তৈরি করা ফোবিয়ার মানচিত্র সযত্নে এঁকেছেন শেচড্রিন!

রাহুল দাশগুপ্ত

নতুন বই

সুদীপ্ত দাস-এর

দ্য এক্কোস ক্ল্যান

সুদীপ্ত দাসের এই প্রথম উপন্যাস (জুলাই, ২০১৩) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে এতটাই সাড়া ফেলে দেয় যে, হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই ১০টি সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাসের তালিকায় স্থান করে নেয়। শিরোনামটিও বেশ ধাঁধালো— এক্কোস গোষ্ঠী। অনেক গোষ্ঠীর নাম শুনেছি কিন্তু এই নামে কোনও ক্ল্যানের নাম জানা ছিল না। বইয়ের শিরোনামের আর্কষণে তড়িঘড়ি বইটা কিনে ফেলে এক নিঃশ্বাসে (অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে নয়) পড়ে ফেলি, কারণ শুরু করার পর ছাড়া কঠিন।

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিয়ে ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে তারা আদতে এসেছিল রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল থেকে। সেখান থেকে ওদের একটা শাখা ভারতে আসে আফগানিস্তান হয়ে। এই মতবাদের কিছু বিরোধী ভারতীয়দের মতে আর্যরা মূলত ভারত থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। কোন মতবাদটা ঠিক তাই নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি। এই প্রাগৈতিহাসিক রহস্যের কিনারা করার জন্য লেখক সাহায্য নিয়েছেন লিঙ্গুইস্টিক প্যালিওনটোলজি (ভাষার জীবাশ্মবিজ্ঞান?), পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ছেলেভুলানো গল্প ও ছড়ার। শেষ দুটি উপাদানে অনেক সময় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার জীবাশ্ম লুকিয়ে থাকে।

দ্য এক্কোস ক্ল্যানের মূল প্লট হল, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত এক উদ্বাস্তু পরিবারের এক নবীন সদস্য ক্রতুর তার পিতৃপিতামহের মূল বাস্তু (ভিটে) বা 'উরহাইমাট' (Urheimat)-এর খোঁজের কাহিনি। অন্য কথায়, আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যরা কোথা থেকে ভারতে এসেছিল তার অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধিৎসার মূলে ছিল ওর ঠাকুমা কুভার বলা ধাঁধা, ছড়া ও গল্প। ওকে এই খোঁজে সাহায্য করে ওর দুই বান্ধবী তিস্তা ও অফসর। এরা সবাই আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। লিঙ্গুইস্টিক প্যালিওনটোলজিস্ট অফসরের মনে হয় যে গল্পগুলি নেহাতই ছেলেভোলানো ঘুমপাড়ানি গল্প নয়। এই গল্পগুলিতে শোনা নামগুলির সগোত্র (কগনেট) শব্দাবলি ঋগবেদেও পাওয়া যায়, এবং এই শব্দগুলির মধ্যে 'উর' (আদিতম) ভাষার জীবাশ্ম রক্ষিত আছে, জানায় অফসর। এবার শুরু হয় ওদের অনুসন্ধানের যাত্রা— আর্যদের মূল ভিটে, 'উরহাইমাট'-এর খোঁজ।

গল্প শুরু হয় ১৯৪৭-এর দাঙ্গার থেকে, যখন ক্রতুর বাবা, জ্যাঠা ও পিসি (কুভার সন্তানরা) এপারে পালিয়ে আসে আর কুভা ওই দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। ঠাকুমা কুভার কাছ থেকে শোনা গল্পগুলি ক্রতুরের দিদি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার আগেই আমেরিকায় গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। একই রকম দুর্ঘটনায় জ্যাঠামশাইও মারা যান কলকাতায়। কুভার বাবা অজ-র পালকপিতা প্রভাত হিন্দুকুশ বেড়াতে গিয়ে অনাথ অজকে সঙ্গে করে দেশে পূর্ব বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। অজর মেয়ে কুভা। প্রভাতের মৃত্যুও হয় অদ্ভুতভাবে। এই তিনটি মৃত্যু ওদের তিনজনের কাছে রহস্যজনক ঠেকে। ওরা আরও

এক্কোস সি থেকে আগত বলে এক্কোস ক্ল্যান বা অশ্বগোষ্ঠীর শাখাপ্রশাখা।

জানতে পারে যে 'হিরণ্যগর্ভ ভারত' নামে একটি সংস্থার মতবাদ অনুযায়ী, আর্যদের আদি বাসস্থান অর্থাৎ 'উরহাইমাট', ভারতে ছিল এবং এখান থেকে ওরা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং ওরা ওদের মতবাদের বিরোধীদের হত্যা করতে পিছপা হয় না। ওই সংস্থার সদস্যরা মনে করে কুভার গল্প, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদির শব্দাবলির মধ্যে নিহিত ভাষার জীবাশ্মের সাহায্যে আর্যদের 'উরহাইমাট' যে ভারতে ছিল না, সে তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাই তারা কুভার পরিবারের সদস্য ক্রতুর, যে ওদের বিরোধী মতবাদের পোষক, তাকে হত্যা করতে আমেরিকায় পৌঁছে যায়, তবে সফল হয় না। এমনকী তার পূর্বে ওরা কুভার সমস্ত পরিবারকে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা করেছিল, তবে ভাগ্যক্রমে কুভা বেঁচে গিয়েছিল। এদিকে এই তিন শখের গোয়েন্দা আর্যরা যে তাদের 'উরহাইমাট' থেকে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে আসে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করার জন্য আর্কাইম (রাশিয়া)-এ পুরাতাত্ত্বিক খননে যোগ দিতে যায় কুভার বলা এক ধাঁধা 'পুরভেদ'-এর উত্তর খুঁজতে এবং তা পেয়েও যায়। ওরা আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতেও ধাওয়া করে কুভার বাবা অজর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে ভাষার জীবাশ্ম থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধার করতে।

ভারতের বৈদিককালীন ইতিহাস ও ভাষার বিবর্তন জানতে আগ্রহী পাঠকদের জন্য বইটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। উপন্যাসটি পড়ে জানা যায় যে 'এক্কা' আর 'এক্কোস' শব্দ দু'টির মধ্যে কেবলমাত্র ধ্বনিগত মিলই নয় অর্থগত মিলও আছে। ঘোড়ায় টানা গাড়িকে এক্কাগাড়ি বলে। এই 'এক্কা' শব্দটা এসেছে ঘোড়ার প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ 'ekwos' থেকে। এই শব্দটার বিবর্তিত শব্দ লাতিন ভাষায় 'equus', সংস্কৃতে অশ্ব আর কুভার গল্পে এক্কোস। ওই সময় ব্ল্যাক সি-র নাম ছিল এক্কোস সি। মূল আর্যগোষ্ঠীর একটি শাখা এক্কোস বা ব্ল্যাক সি থেকে রাশিয়ার আর্কাইম ও আফগানিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। লেখকের মতে, এক্কোস সি থেকে আগত বলে আমরা হলাম এক্কোস ক্ল্যান বা অশ্বগোষ্ঠীর শাখাপ্রশাখা।

গল্পের শেষাংশ পাঠককে চমকে দেয় ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে আর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, যা এতক্ষণ ধরে পাঠককে আকৃষ্ট করে রেখেছিল, তার আর কোনও যোগ নেই। এখান থেকে গল্পটা মোড় নেয় সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের দিকে।

সান্ত্বনা বসু

অন্য খবর

এবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন কানাডার লেখিকা **অ্যালিস মুনরো**। মূলত ছোটগল্পকার হিসাবেই সারা পৃথিবীজোড়া পাঠকমহলে খ্যাতি তাঁর।

এবছর ম্যান বুকার পুরস্কার পেল **ইলিয়েনর ক্যাটন**-এর উপন্যাস 'দ্য লুমিনারিস'। চূড়ান্ত বাছাইয়ে ছিল কম টয়বিন-এর 'দ্য টেস্টামেন্ট অফ মারি', রুথ ওজেকি-র 'এ টেল ফর দ্য টাইম বিয়িং', ঝুম্পা লাহিড়ির 'দ্য লো ল্যান্ড', জিম ক্রেস-এর হারভেস্ট, ইলিয়েনর ক্যাটন-এর 'দ্য লুমিনারিস' এবং নোভিয়োলেট বুলাওয়ায়ো-র 'উই নিড নিউ নেমস'।

১৭ নভেম্বর লন্ডনে ৯৪ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন **ডোরিস লেসিং**। লেসিং ২০০৭-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে

₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়

অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:

for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** *সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** *গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত
বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।

প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য ২০০ টাকা।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ভ্রমণ
www.bhraman.com

ছেলেবেলা
www.echhelebela.com

কালের কষ্টিপাথর
www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

হীরু ডাকাত ₹৪৫

শাদা ঘোড়া ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে ₹৫০

ভূতের বাঁশি ₹৪০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি ₹২০

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মৈত্রেয়ী নাগের আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে
সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই সব পত্রিকা ও হীরু ডাকাতের সিডি এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR ◻ Vol. 2 No. 5-6 ◻ 1 November-December 2013 ◻ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

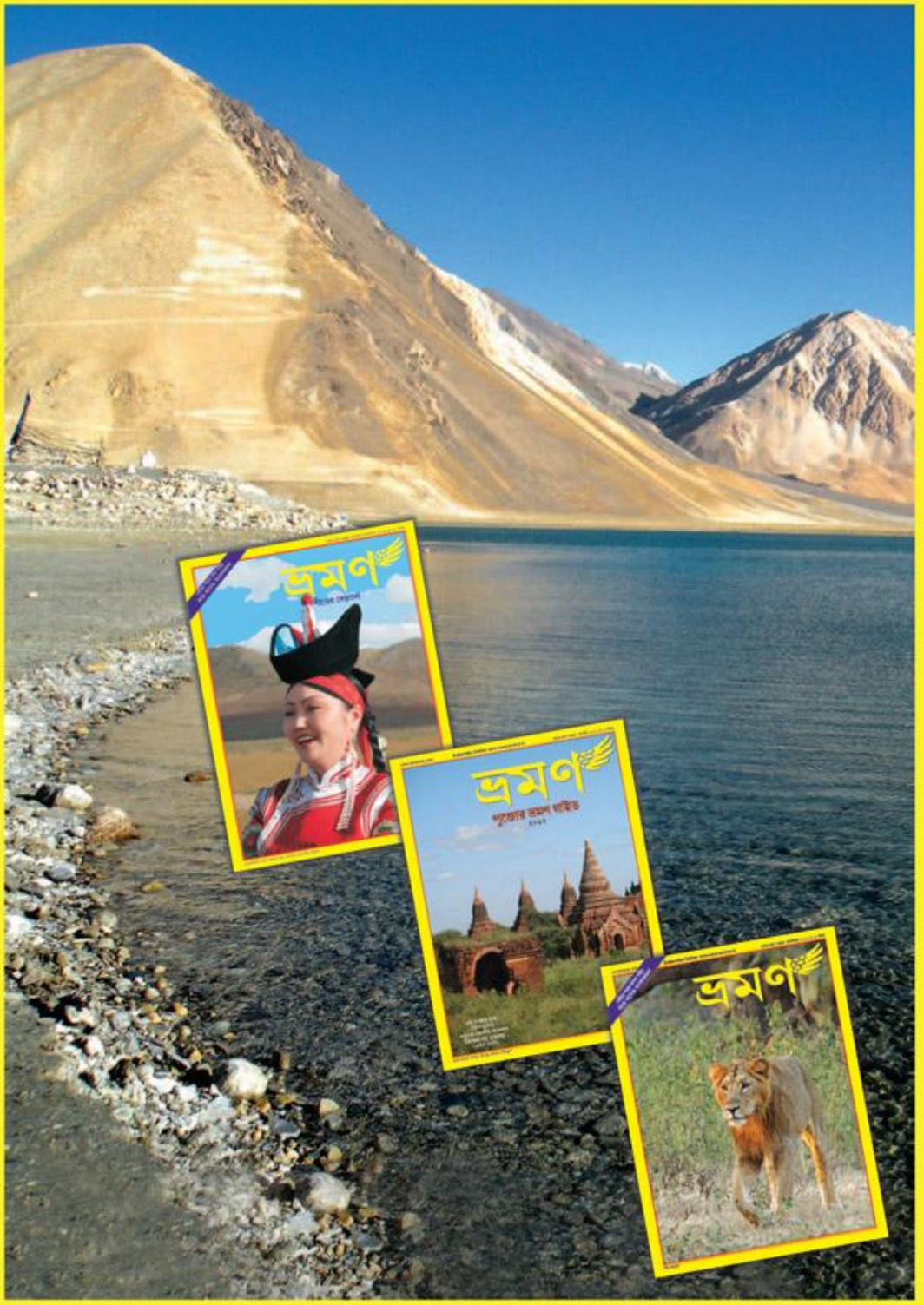

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*